আলোর পথিক

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

সহযোগিতা ঃ- অনির্বাণ, দেবতনু

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৭ -- ২৭শে জুন, ২০১০

মুদ্রণ -- মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট কোলকাতা - ৭০০০০১

চিঠিপত্র ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যোগাযোগ ঃ-
"অভিনব দর্শন"
স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৪নং পল্লীশ্রী, ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
মোবাইল - ৯২৩১৮-৯২০৮৫, ৯৪৩২৩-৭২০৭২
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in
Website : www.avinabadarshan.com

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
২) ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯
৩) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক-বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

পূর্বাভাষ

আমরা এই পৃথিবীতে এসেছি সীমিত পরমায়ু নিয়ে। এসেছি বলে চিরকাল থাকবো, তাতো নয়। সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে। আর যাওয়ার সময় এখানকার বিষয় সম্পত্তি, বাড়ী, গাড়ী, গয়নাগাটি, মান-সম্মান, যশ-খ্যাতি, এমনকি একবিন্দু জলও কারও নিয়ে যাওয়ার অধিকার বা ক্ষমতা নেই। যা কিছু এখানকার সবই ভোগের (প্রায়োজন অনুযায়ী) মধ্য দিয়ে ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। শুধু এখান থেকে নিয়ে যাব আমরা এখানকার কর্মফলের ক্যাপিটালটা অর্থাৎ ভালমন্দ যে যা কাজ করবে, তার রেজাল্টটা। যদি কখনও আবার বার্থ (জন্ম) হয়, তখন হয়তো এখানকার কর্মের ক্যাপিটালটা কাজে লাগতে পারে। তাই এই স্বল্পায়ু জীবনে সকলের হিতকামনায় কিছু শুভ কাজ করে যাওয়াই, প্রতিটি মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

এই সমাজ জীবনে বাস্তবক্ষেত্রে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা যে যা কিছু করছি, বেশীরভাগ দেখেশুনে বুঝেই করছি। সংসারের মায়াজালে যশ মান লোভ অহঙ্কারের জালে যতই আবদ্ধ হচ্ছি, ততই ত্রুটি-বিচ্যুতি, অপরাধের মধ্যে আরও জড়িয়ে পড়ছি। পরিণাম স্বরূপ জ্বালা-যন্ত্রণা, হতাশা নিরাশার মধ্য দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, অন্ধকারের অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছি।

আজ আমাদের চারিদিকে শুধু অপরাধের পর অপরাধ, অন্যায়ের পর অন্যায়ের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। প্রতিকারের চিৎকার আছে, কিন্তু প্রতিকার নেই। এই সমাজে প্রায় কেহই সম্পূর্ণ আদর্শ নিয়ে চলে না। আদর্শ বজায় রেখে চলার প্রয়োজন বোধ করে না। অনেকেরই অনেক দিক থেকে আদর্শগত অভাব রয়েছে। সামনাসামনি দু'চার কথা বললে হাসি বা বিনয় দেখে অভিভূত হয়ে, তাদের কথার উপর আস্থা স্থাপন করলে, প্রতি পদে পদে হেনস্থা হতে হবে। নীতি আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে, সমাজকে খণ্ড খণ্ড করে, আজ নিজেদের স্বার্থ, রাজনীতির স্বার্থ, দল ও সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিকটা এত বেশী প্রবল হয়ে গেছে যে, দেশের কথা, দশের কথা, মাটির কথা কেউ ভাবে না।

আবার ধর্মের দিক থেকে, আধ্যাত্মিকতার দিক থেকেও সমাজে আজ পর্যন্ত কোন সুরাহা হলো না। আমাদের দেশে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ম চলেছে গল্প, কল্পনা, ভাব আর উচ্ছ্বাসের উপর। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম সম্পূর্ণ বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই দুঃখময় জীবনে নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ, আলোর পথ দেখাতে পারেন, একমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন জন্মসিদ্ধ মহান। সকল প্রকার সাধনায় সিদ্ধ হয়েই যিনি জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই জন্মসিদ্ধ। এখানে (এই পৃথিবীতে) এসে তাঁকে কোনপ্রকার সাধন ভজন, জপতপ করতে হয় না।

পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে আজ থেকে কয়েক কোটি বছর আগে। মহাপুরুষ, সাধক, অবতার এই ধরাধামে অনেক এসেছেন। কিন্তু জন্মসিদ্ধ মহান কয়জন এসে এই ধরাধামকে পবিত্র করেছেন, গুণে বলা যায়। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অন্যান্য সাধু গুরু মহানদের সাথে জন্মসিদ্ধ মহানের উদ্দেশ্যের এক বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

পৃথিবীর ইতিহাসে যে সব মহান, অবতার এসেছেন, তাঁরা সকলেই আংশিক সমাধানের চেষ্টা করেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল হয় সমাজ থেকে শোষক, অসুরদের অপসারিত করে শান্তি স্থাপন করা; না হয় কিছু সংখ্যক মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া। কেউ কেউ শুধু মানব কল্যাণের কথাই চিন্তা করে গেছেন। সমাজের সার্বিক উন্নতির কোন চেষ্টাই তাঁরা করেননি। কিন্তু যাঁরা জন্মসিদ্ধ মহান, তাঁদের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি আরও ব্যাপক। তাঁরা চান জীবের সার্বিক কল্যাণ, যাতে শুধু মানুষই নয়, জীবজগতের সমস্ত জীব আধ্যাত্মিকতার বিরাট সুরের পথে এগিয়ে যেতে পারে। সুতরাং জন্মসিদ্ধ মহানের কাজের ধারা অন্যান্য মহানদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

জন্মসিদ্ধ মহানের উদ্দেশ্য আদিবেদের নির্দেশগুলি তুলে ধরে, প্রকৃতির গ্রন্থ বিশ্লেষণ করে, সবার চোখ খুলে দিয়ে, চিরসত্যকে উপলব্ধি করার পথ প্রদর্শন করা। তাই কখনও কখনও তাঁদের কথা রাজনীতির মতো শোনায়। আসলে তথাকথিত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কোন কথাই তাঁরা বলেন না। কারো সঙ্গে তাঁদের কোন বিবাদ নেই। সকলকে প্রেম, ভালবাসা দিয়ে তাঁরা কাছে টেনে নিয়ে, জ্ঞান চক্ষু খুলে দিয়ে, নিজে ইঞ্জিন হয়ে ভক্ত শিষ্যদের বগী করে মুক্তির পথে, আলোর পথে টেনে নেন (পৌঁছে দেন)। যখন সমস্ত মানব সমাজ এক অবিচ্ছিন্ন শান্তি ও সমতার নীতিতে গড়ে উঠবে, জীবজগতের সবাই যখন সেই সুরে সাড়া দেবে, তখন অনন্ত মহাকাশের আধ্যাত্মিক পথের বাতায়ন জীবের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তুচ্ছ হয়ে যাবে সিদ্ধি, মুক্তি, নির্বাণ। দেব-মানবের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে উন্মুক্ত হয়ে যাবে, বাস্তব ও আধ্যাত্মিক জীবনে উৎকর্ষ সাধনের এক সুউচ্চ সোপান।

হে ঠাকুর, হে অনন্ত সুরের পথিক, হে আলোর পথিক প্রকৃতির ধারাপাতা ধরে ধরে, অনন্ত মহাকাশের যাত্রিক হয়ে, তোমার ইঞ্জিনের সাথে বগী করে, আমাদের পৌঁছে দাও সেই সুদূরের দেশে, সেই সুরের দেশে, আলোর দেশে; যেখানে চিরযুগ চিদানন্দে মহানন্দে অবগাহন করতে পারি। আজ এই প্রার্থনা করি তোমার শ্রীচরণকমলযুগলে।

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনও ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। সেই সকল অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের ৩১-তম শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হলো **'আলোর পথিক'**।

পরিশেষে জানাই, পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, যে সকল ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৭ — *চপল মিত্র*

ইং ২৭শে জুন, ২০১০ — *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

আমি চাই না মন্দিরে দেবতাদের তালা বন্ধ করে রাখা হোক।

সুখচরধাম

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩

খুব ক্লান্ত হয়ে এসেছি। শরীরটা অসুস্থ। দিনরাত পরিশ্রম করছি। একটুও সময় পাচ্ছি না। এই বর্ত্তমান পরিস্থিতি দেখে মন মোটেই ভাল যাচ্ছে না। এখন আর কিছু বলতে ইচ্ছা করছে না। এখন প্রত্যক্ষভাবে মাঠে না নামা অবধি শান্তি নাই। যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, কোন হিতোপদেশে কাজ হবে না। কারণ হাজার হাজার বছর আগে শাস্ত্রকাররা যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সেই নির্দেশমতো এখন কেউ চলছে না। **মানুষ এখন এতবেশী স্বার্থপর হয়ে গেছে যে, ধর্মকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে কেটে স্বার্থে ব্যবহার করছে। রাজনীতিকে স্বার্থে ব্যবহার করছে। দলগত, সম্প্রদায়গতভাবে স্বার্থের দিকটাই এত বেশী প্রবল হয়ে গেছে যে, দেশের কথা কেউ ভাবছে না। মাটির কথা কেউ ভাবছে না।** মনে হয়, আমরাও বেশী ভাবতাম না, যদি এই বয়সে ঠাকুর বাদে অন্য কিছু হতাম।

শিশুবয়স থেকে এই পথে আছি বলেই, ভাবনাটা বেশী জড়িয়ে ধরেছে। আজকের সমাজের এই পরিস্থিতি নিয়ে প্রত্যেকেই ভাবে। কিন্তু ভাবনার মাত্রা সীমাতে আবদ্ধ। তার কারণ প্রত্যেকটি ঘরে ঘরেই অভাবের ছোবল লেগে রয়েছে। প্রতিটি সংসার দারিদ্র্যের কবলে রয়েছে। ধর্ম তো অনেক পরের কথা। যে ধর্মকে এখানে যেভাবে চোখ দিয়ে দেখতে চাইছে, সেই ধর্মের কথা শুধু কথার মাঝে কথায় কথায় রয়ে গেছে। তার সমাধান আজও সম্পূর্ণভাবে করতে পারেনি। কিন্তু না পারলেও, না হ'ল এদিক, না হ'ল ওদিক। গোটা সমাজটাই আজ অভাবের সম্মুখে রয়ে গেছে। প্রতিকার কোন কিছুরই নেই। প্রতিবিধানও নেই। কেউ যে এগিয়ে এসে লাগাম ধরে বলবে, 'চল, সমাজকে দানবের হাত থেকে মুক্ত করবো,' সেরকম সৎসাহস, কোন নেতার মধ্যে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ আজ নেতা হতে গেলেই বেশীরভাগই

পকেটভারীর চিন্তা করে। বেশীরভাগের মধ্যে নেতা সাজবার প্রলোভনটাই বেশী। আজ সেটাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তিন কোটি মানুষ তো আমাকে ঠাকুর বলে। তিন কোটি লোকের ঠাকুর হতে গেলে আমার তুঙ্গে উঠতে হবে, মানুষের কাছে কিভাবে যশ উপার্জন করবো, তার প্রচেষ্টা থাকবে। আস্তে আস্তে প্রলোভনের জিহ্বাটা বড় হয়ে যাচ্ছে। এরকম হলে, তার দ্বারা কোন কাজ হাসিল হবে না। **প্রলোভনের বশীভূত হলে চলবে না। নেতা হতে গেলে, কাজ হাসিল করতে গেলে, প্রলোভনকে জয় করতে হবে। সাধারণ কর্মীর সাথে সাধারণ হয়ে, তাদের সুখদুঃখের সাথে এক হয়ে যে এগিয়ে যাবে, সেই পারবে একমাত্র কাজ করতে।** সেটা আজ মুখে মুখেই আছে। সত্যিকারের লোভহীন ব্যক্তি, নির্লোভ ব্যক্তি বিরল।

ভারতবর্ষে এত কোটি লোক, একজনও কি মাথা চাড়া দিয়ে সমাজকে ধরে রাখতে পারছে না? শুধু বড় বড় কথাই আমরা বলছি, 'সমাজ থেকে শোষক হঠাও।' 'মজুতদারদের হঠাও।' 'শোষণ বন্ধ কর'। 'প্রত্যেকের অভাব অভিযোগ দূর কর' ইত্যাদি। এসব তো শত শত বছরের কথা। কিন্তু ধাপার মতো অভাবের স্তূপ তো রয়ে গেল। এত স্তূপাকার হয়ে গেছে যে, মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো ক্ষমতা আর নেই। মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। যার যার ব্যক্তিগত সংসার, ব্যক্তির চিন্তায় মন দুর্বল হয়ে গেছে। বালবাচ্চাদের খাওয়াতে পারবে না। পরাতে পারবে না। যদিও বা কেউ অন্যায়ের প্রতিবাদ করে, চাকরীটা খতম হয়ে যাবে। নাহলে transfer করে দেবে। এইসব নানান ভয়ে কেউ আর এগুতে পারছে না। তাই আমরা নির্যাতনের পরে নির্যাতন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করে যাচ্ছি বা যাব। ভারতবর্ষের কথাই বলছি। ভারতবর্ষের সম্পত্তি কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এখানে সকলের সমান অধিকার। যার যতটুকু প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনবোধে ততটুকু নেবার অধিকার প্রত্যেকের থাকবে। কিন্তু আমরা তা থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি। আমরা বলি, সাম্যের কথা। **আমাদের বেদে আছে, সমতার কথা। সাম্যের কথা, সমতার কথা বললে কি হবে? কোথায়? আমরা নিজেরাই তো সাম্যের মধ্যে নেই। ব্যতিক্রমে রয়েছি, বৈষম্যে রয়েছি।**

ভাল খাবারটুকু পেলে আমরা মন্দের দিকটা তুলে ধরবার চেষ্টা করছি না। বেদ তো তা বলেনি।

শিশুবয়স থেকে আমি যে আদর্শকে সবার কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছি, সেটা হ'ল বেদের কথা। এটা রাজনীতির কথা নয়। অনেকে বলে, ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী রাজনীতি করেন। আমি রাজনীতি করি না। বেঁচে থাকার নীতি, শান্তি পাবার নীতি, অসুরের কবল থেকে মুক্ত করার নীতিকে রাজনীতি বলে না। আর একে যদি রাজনীতি বলা হয়, সেই রাজনীতি নিশ্চয়ই করবো। ধর্ম করছে মানুষ মুক্তির পথ পাবার জন্য, মৃত্যুর পরে দরজা খোলার জন্য। ঐ মৃত্যুর পরে দরজা খোলার কথা আমি বলি না। অনেকে আত্মার মুক্তির কথা বলে। এইভাবে আত্মার মুক্তি হয় না। আত্মার মুক্তি হতে হলে, সমাজের এই দুরবস্থা দূর করতে হবে।

একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পূজা-পার্বণ করে, সদা সত্য কথা বলে। কিন্তু নামাবলীর তলায় চাল নিয়ে যাচ্ছে। নামাবলীর তলায় চাল নিয়ে যাচ্ছে কেন? সে লুকিয়ে চাল নিয়ে যায়। তাহলে আদর্শ-চ্যুত হয়ে যাচ্ছে। উপায়ান্তর নেই। বাড়ীতে বালবাচ্চারা না খেয়ে থাকে। সুতরাং নামাবলীটাই সম্বল করে সে যতটুকুনু পারে, বেআইনি রাস্তায় নেমে গেছে। বেঁচে থাকার জন্য সে এটা করেছে। তার দরকার আছে। ঐরকম লুকিয়ে লুকিয়ে বেআইনির আশ্রয় নিলাম। আর বাইরে দেখালাম সততার চরম সীমায় আমি আছি। আদর্শছাড়া আমি চলি না। ঐরকম দু'মুখী কথা আমি বলতে রাজী নই। যা করবো, সবাইকে জানিয়েই করবো। ফাঁকিঝুঁকি দিয়ে কাজ উদ্ধার করা আমার ধর্ম নয়। সুতরাং আজকের এই পরিস্থিতিতে ধর্মকে কেন্দ্র করেই আমি এগিয়ে যেতে চাচ্ছি। এগিয়ে যেতে চাচ্ছি শুধু এই নয়, বর্ত্তমান পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলে মিষ্ট কথায় হবে না। কারণ আজকের রাজনীতি হ'ল নিজেদের ঘরে ঘরে মারামারি।

আমার কাছে হাজার হাজার লোক আসে। বলে, 'বাবা, পাড়ায় যেতে পারবো কি না? ঘরে যেতে পারবো কি না?'

আমি বলি, 'ক্যান্? কারণটা কি? বাঘ টাঘ আছে নাকি?'

তারা বলে, 'না বাবা, রাজনীতি।'

—ওরে বাবা। **রাজনীতির ভয়ে বেশীরভাগই ঘরছাড়া। যে যখনই রাজনীতি করে, তখন পাড়াটা হইল তাদের। তাদের অনুমতি ছাড়া বাড়ীওয়ালা বাড়ীতে থাকতে পারবে না। ভাড়াটেরা বাড়ী ভাড়া নিতে পারবে না। বাড়ী কিনতে গেলে তাদের সেলামী দিতে হবে। আরে বাপরে বাপ। অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।** এদের সাথে কেউ কিছু মোকাবিলা করছে না। কারও হিম্মৎ নাই। তাহলে পাড়া থেকে উঠে যেতে হবে। এই দূরবস্থার ভিতর দিয়া বেশীরভাগ জনগণ আজ আমরা দিন কাটাচ্ছি। কোন সুব্যবস্থা নাই। প্রতিকারের আশায় থানায় গেলে থানা চুপচাপ। তারা কথা বলে না। বরং উল্টোটা হয়ে যাচ্ছে। কে যে ভাল, কে যে মন্দ, কার কি, কাকেও ব্যক্তিগত দোষারোপ আমি করছি না। যা ঘটছে, তাই বলছি। সুতরাং এরে তেল মাখা, তারে তেল মাখা, ঐসবে দরকার নাই। তিনকোটি সন্তান করেছি। গুরুগিরি বাড়াবার জন্য নয়। তাদের বলেছি, 'দেখরে বাবা, আমি দক্ষিণা টক্ষিণা নিই না। টাকা পয়সা আমার দরকার আছে। তবে ধর্মের দোহাই দিয়া যাগযজ্ঞ, পূজাপার্বণের মাধ্যমে আমি অর্থোপার্জন করি না। আমি খেটে খাওয়া লোক। খেটে পরিশ্রম করে খাই। কথা হ'ল ৩ কোটি সন্তান নিয়ে আমি কি মাথায় করে নাচবো নাকি? এমনি এমনি? বাংলা ভারতবর্ষের বুকে এই মস্তানিগিরি করে, এইসমস্ত অনধিকার চর্চা করা, আর মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করা, আর কতদিন চলবে? ক্ষমতাবলেই হোক আর যেভাবেই হোক, ভারতবর্ষের বুকে ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে মানুষকে দাবিয়ে রাখা, এটা চলতে দেওয়া হবে না। আমার এই ৩ কোটি সন্তানের মধ্যে ২ কোটি সন্তানকে যদি মাঠে নামিয়ে দেই, ঐ সমস্ত শয়তানদের, দানবদের, শোষকদের মোকাবিলা করার জন্য যদি আমরা প্রস্তুতি নিয়া চলি, তবেই হবে আমার এই দীক্ষা দেওয়া সার্থক। তার কারণ আমি গুরুগিরি করে জমিদারী হাঁকাতে চাই না। আজকে ভারতবর্ষে শিষ্যের মাথায় হাত বুলিয়ে, তাদের শোষণ করে অর্থোপার্জন করার মনোবৃত্তি নিয়ে, আমি চলি না। আমি চাই বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যেই সমস্ত শয়তান গুরু মহান রয়েছে, ধর্মের নামে মানুষের সেন্টিমেন্টের সুযোগ নিয়ে, যারা সমাজকে

শুষছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

আজকের সমাজে দরকার নাই অবতার, দরকার নাই মহাপুরুষ, দরকার নাই গুরু। আমি চাই সংগ্রাম। প্রত্যক্ষভাবে মাঠে নেমে শয়তানদের কিভাবে শায়েস্তা করতে হয়, তারজন্য নিচ্ছি প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতি নিয়ে মোকাবিলা করবো, সে যেই হোক। বাপ হোক, খুড়া হোক, আর জ্যাঠা হোক, কাউকে টিকতে দেওয়া হবে না। **বাংলা ভারতবর্ষের মাটি নিয়ে যারা ছিনিমিনি করছে আর পকেটভারী করছে, তাদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দাও। মনে রেখো, আমি যে কথা বলি, সেইমতো কাজ করি। এটা হুমকি নয়, ভয় দেখানো নয়। হুমকি দিয়ে কাজ করানো বালক ঠাকুর নয়।** বালক ব্রহ্মচারী আমার নাম নয়। পাঁচ বছর বয়স থেকে এই পথে আছি বলে সকলে 'বালক ঠাকুর', 'বালক গোঁসাই' বলতো। তাই সেই নামটা সবার মুখে মুখে রয়ে গেছে। বাবার দেওয়া নাম খোকা। ছেলের ৬০ বছর বয়স হলেও বাবা যদি জীবিত থাকেন, ৬০ বছরের ছেলেকে খোকা বলেই ডাকেন। সেরকম আমারবেলাও 'বালক বালক' কথাটা আজও রয়ে গেছে। এটা রূপকও নয়, গল্পও নয়। আজও আমার মাষ্টার, আমার সহপাঠীরা, আমার প্রতিবেশীরা যাদের আমি মাসি, পিসী ডাকতাম, তারা আমায় 'বালক' বলেই ডাকেন। তাতে আমি তুঙ্গে উঠে যাইনি।

আমি ভগবান সাজতে চাই না। আমি ভগবানের বাপ সাজতে চাই না। এখানকার গুরু, মহান হতে চাই না। আমি সাধারণ কর্মী। কর্মের ভিতর দিয়ে আমি সবাইকে পেতে চাই। তাই যে সন্তানদল করেছি, এটা রাজনীতির দল নয়। এক বিরাট সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। এরা বাহক, এরা বেদ প্রচারক। অনেকে আমার সন্তানদের পিছনে লেগেছে। অনেক জায়গায় সন্তানদলের কাজে বাধার সৃষ্টি করছে। তারা মনে করছে, হাম্‌সে হাম। বিভিন্ন **রাজনীতির দলের লোকেরা ভুলে গেছে, তারা কাজ করবে, পারমিট লাইসেন্সের প্রলোভনে। আমার তিন কোটি সন্তান আসবে দিলের মোহে। তাদের খাওয়া নাই, পরা নাই। লক্ষ লক্ষ লোক নির্বিচারে জলে ঝাঁপ দিয়ে মরবে। তাদের এভাবে তৈরী করেছি। সুতরাং সমাজে যারা শয়তানি করছে, তাদের কিছুতেই**

ছাড়বো না। এইটাই আমার ধর্ম। আমার ধর্ম শয়তান পিটানো। বাংলা ভারতবর্ষে যত শয়তান আছে, একধার থেকে পিটাও। আমি সরকারকে জানাবো, ভারতবাসীকে জানাবো, দেশের সবাইকে জানাবো যে, কোন্‌দিন কোন্ সময়ে আমার ২ কোটি সন্তান নিয়ে মাঠে নামবো। এমনি কেউ কারও মাথায় বাড়ি (আঘাত) দেবে না। কারও প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ আমার নেই। শয়তানদের কিভাবে লাঠিপেটা করতে হয়, তার ব্যবস্থার জন্য আমরা এগিয়ে যাব। তারজন্য আমি তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি, তোমাদের যদি প্রস্তুতি নেওয়া থাকে, তোমরা আস।

সরকারের যদি শয়তান পিটানোর হিম্মত না থাকে, সন্তানদলের ছেলেদের হাতে তিন মাসের জন্য ছেড়ে দাও। সরকার তো অনেককে অনেক কন্ট্রাক্ট দেয়, এই কন্ট্রাক্ট, সেই কন্ট্রাক্ট, আমাদের কন্ট্রাক্ট দিয়ে দাও। ভারতবর্ষকে কিভাবে ঠাণ্ডা করতে হয়, দেখিয়ে দিচ্ছি। আমরা কোন গদী চাই না। কোন কিছু চাই না। টাকা না, গদী না, সম্মান না। শুধু চাই ভারতবর্ষের মাটিতে সবার সমান অধিকার। এ আমার বেদের সাধনা, আমার বেদের ধারা। গুরুগিরি করে আমি অনেক অপবাদ নিয়েছি। যেমন জমিমারার কেস, ডাকাতির কেস, ছিনতাইয়ের কেস ইত্যাদি। আমি মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের ভবিষ্যদ্বাণীর শেষ রক্ত। তাঁর মাতুলবংশে ভাগিনেয় রূপে তের পুরুষের শেষ রক্ত। এটা বেইমানের রক্ত নয়। ভুলে যাবে না। সুতরাং এই রক্তে কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না। আমি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে আমার বুকে টেনে নিতে চাই। সবাইকে কোল দিয়ে সবাইকে শান্তিতে রাখবার প্রচেষ্টাই হচ্ছে আমার একমাত্র সাধনা। সুতরাং অযথা মানুষকে ধর্মের কথা বলে বিভ্রান্ত করতে আমি রাজী নই। আজকে ধর্মের কথা বলে অনেকেই সমাজকে বিভ্রান্ত করছে।

যারা সরকারে আছে, তাদের গদীচ্যুত করবার ইচ্ছা আমার নেই। আমার ইচ্ছা যে যেভাবে আছে, থাকুক। কিন্তু ভারতবর্ষের জনগণের জন্য যদি দরদ না দেখি, তাদের প্রতি আমার দৃষ্টি থাকবে না। আমি গ্রামে যাই, এইরকম একটি চাদর গায়ে দিয়ে। আমি লক্ষ টাকার পোষাক পরতে পারি। তিন কোটি সন্তান যার, মাসে ১টি করে টাকা দিলে তিন

কোটি টাকা হয়। আমার সন্তানদের অনেকেরই গাড়ী আছে। কিন্তু আমার নিজস্ব কোন গাড়ী নেই। যাগযজ্ঞ, পূজাপার্বণ করে ১টি পয়সাও আমি গ্রহণ করি না। আমি আমার সন্তানদের সাথে এক সংসারে একান্নভুক্ত পরিবারের একজন হয়ে মিশি। কিন্তু **আজকের ধর্ম আমাদের কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে। ভিক্ষুক তৈরী করে দরিদ্রতার সৃষ্টি করেছে।** নিজেদের মধ্যে চরম হিংসা আর মারামারি কাটাকাটি। এছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না। চারিদিকে চলছে ডাকাতি, ছিনতাই, মারামারি। প্রতিকার কেউ তো করছে না। কোন প্রতিকার নাই। প্রতিকার আমাদের নিজেদের হাতে না নিলে হবে না।

দেবতারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন। তাঁরা অসুরদের পরিষ্কার করেছিলেন। দেবতাদের আর আমপাতা, কাঁঠালপাতা, বেলপাতা না দিয়ে পরিষ্কার তাঁদের অস্ত্রগুলো আনতে হবে। সেই অস্ত্র দিয়ে শয়তানদের সাথে মোকাবিলা করতে হবে। এছাড়া আর কথা নাই। আমি বেশীকিছু বলতে চাই না। মনের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। কারণ সত্যকথা বললে জেলে যেতে হবে। মিথ্যা কথা বললে সুনাম হবে। আমি সত্যকথা বলবো। আমার জেল হয়েছে, হাজতে গেছি। অনেককিছু face করেছি। কোনকিছুর পরোয়া করি না। হয় ফাঁস, নয় খালাস। আমি যুদ্ধ করেই জয়লাভ করেছি। আমি তোয়াজ করতে জানি না। মৃত্যু একদিনই হবে। কারও পরোয়া করে মৃত্যু আমি গ্রহণ করতে পারি না। আমি পরিষ্কার জানিয়ে দেব। না জানিয়ে কোন কিছু করবো না। না জানিয়ে যদি আমার সন্তানরা কেউ কিছু করে, তারজন্য আমি দায়ী নই। তিন কোটি সন্তানের মধ্যে না আছে এমন জিনিস নেই। তাদের কাছে বন্দুক আছে, ষ্টেইনগান আছে, ব্রেণগান আছে। কার কাছে আছে জানি না। বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার অস্ত্রশস্ত্র আসছে। আমি যদি বলতে যাই, আমার কাছে পুলিশ এসে উপস্থিত হবে। তারা বলবে, 'আপনি তো জানেন, কার কাছে ষ্টেনগান, ব্রেণগান আছে।'

—আছে জানি। তারা আমার কাছে বলে না। এগুলো ডাকাতি করার জন্য নয়। কথা হল, এগুলো যে আছে, কিসের জন্য? বেদের তত্ত্ব, বেদের ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য; শয়তানদের সাথে মোকাবিলা

করার জন্য, আত্মরক্ষার জন্য। খুন তাদের ধর্ম নয়। সেই শিক্ষা তাদের দিইনি। খুন আমার ধর্ম নয়। কিন্তু খুন করতে এলে, ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজোও করবো না। একেবারে পরিষ্কার নীতি। বাঁচবার জন্য অস্ত্রধারণ করতে আমি বাধ্য। আজকে আমরা আক্রান্ত। আমাদের খাওয়া জোটে না, পরা জোটে না। বালবাচ্চাদের খাওয়াতে পারি না, পরাতে পারি না। আমরা চুপচাপ বসে আছি। আমরা মূর্খ বলে বসে আছি। আর বসে থাকার সময় নাই। তোমরা সবাই আস (এস)। আমরা এগিয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাই। এখন ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় এসেছে। এইরকমভাবে চলতে পারে না। সুতরাং আমার তিনকোটি সন্তান নিয়ে যদি মাঠে নামি, যেই আমাদের বিরুদ্ধে আসবে, তাদের পতন হবে। আমরা তো মরছি। রক্ত দিয়ে ভাসিয়ে দেবে সব দেশ। যারা আসবে আমাদের বিরুদ্ধে, বুঝেশুনেই আসবে। রাজত্ব করবে কে? তিনকোটি লোককে খোঁচা দিতে হলে একটু সমঝে চলতে হবে। একেবারে খ্যাটখ্যাট করে আসলে হবে না। একেবারে কাঁপিয়ে ছেড়ে দেব বাংলা ভারতবর্ষ। সেইভাবে প্রস্তুতি নিয়েছি। কিন্তু কারও ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে নয়। তাদের গদীচ্যুত করার জন্য নয়। তাদের গদী দখল করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

দেশের মা বোনেদের মুখের গ্রাস যারা কেড়ে নিচ্ছে, সেই হাতগুলিকে কেটে দেবার ব্যবস্থা কর। আমি ধর্মের কথা জানি, মাহাত্ম্যের কথা জানি। লক্ষ্মী নারায়ণের কথা জানি। আমার মুখে সেই কথা থাকবে না। **যেদিন পর্যন্ত দেশের জনগণের মুখে হাসি না দেখবো, ততদিন আমার মন্দিরে আমি চাই না কাঁসি ঘণ্টা। আমি চাই না মন্দিরে দেবতাদের তালা বন্ধ করে রাখা হোক। তালা খুলে দাও। মন্দিরের আদর্শ দেশে প্রচার কর। সেইভাবে কাজ কর। মন্দিরের দেবতা বলেছেন, 'অসুর দমন করাই আমাদের শ্রেষ্ঠ নীতি।' তালাবন্ধ করে তাদের arrest করে রাখবে না। সুতরাং তাদের আদর্শকে প্রচার কর।** আমি দেবতাদের আদর্শ সবার কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। সবার কাছে এটাই কামনা করছি।

মহাপ্রভু শেষ পর্যন্ত শেষ কাজ শেষ উদ্দেশ্যে করে যেতে পারলেন না। শত্রুরা করতে দিল না। তাঁর এই শেষরক্ত যেন মহাপ্রভুর

শেষ উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে সফল করতে পারে। আমি সকলের কাছে এই কামনা করছি। আমি সাহায্য চাই সকলের কাছে। তোমরা সবাই আস (এস)। আমরা সবাই একই মাটির আসনে বসবাস করছি। একই চন্দ্রসূর্যের তলে আমরা সবাই একই বংশজাত, একই পৃথিবী মায়ের গর্ভজাত সন্তান। আমরা সবাই ভাই ভাই হয়ে ঐ সমস্ত দানব, শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চাই। সংগ্রাম ছাড়া দেশকে মুক্ত করা যাবে না। তাই আমরা সেইভাবে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি। এই বেদপ্রচার করতে গিয়ে আমাকে অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয়েছে। আমি একাকী ঝড়ের বিরুদ্ধে তরী ভাসিয়ে দিয়েছি।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু দিয়ে গিয়েছিলেন হরেকৃষ্ণ হরেরাম। তারই আরেক নামে নাম, মহাকাশের মহা নাম মহা স্বরগ্রাম রাম নারায়ণ রাম। এই নাম আমি সবার কাছে পৌঁছিয়ে দেবার চেষ্টা করছি। এই রাম নারায়ণ রাম এখানকার রাম নারায়ণ নয়। এঁর অর্থ বিরাট, চিন্তা বিরাট। কার্যক্ষেত্রে সেই অর্থবোধে বিশ্লেষণ করে এই মহানাম আমি সবার কাছে পৌঁছিয়ে দিতে চাই। আমি সবাইকে এক সুরে গাঁথতে চাই। আমি কোন সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলি না, রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলি না। কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আমার নাই। আমার অভিযোগ আমার উপরে, আমাদের উপরে। আমরাই মানুষ নই। আমরাই কোন প্রতিকার করছি না। সমাজকে দেখছি না। কোন ব্যবস্থাই করছি না। একটু সুষ্ঠু ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য আমরা চেষ্টা করছি। সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছি।

শরীরটা অসুস্থ। বেশী কিছু বলতে পারছি না। বড় ক্লান্ত। আমার কাছে দীক্ষা নিতে টাকা পয়সা লাগে না, অর্থ কড়ি লাগে না। **দীক্ষা দিয়ে সবাইকে এক সুরের বন্ধনে এনে, সবাইকে নিয়ে আমরা আলোর পথের পথিক হয়ে, এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছি।** যে সুর আমি শিশুবয়স থেকে পেয়েছি, সেই সুরের ধারায় সবাইকে প্রতিষ্ঠিত করাই আমার কাজ। তাই জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাই একত্রিত হয়ে এই মহামন্ত্র গ্রহণ করতে পারে।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

হে জগন্নাথ, আমরা যেন তোমার রথের চাকা হয়ে, তোমার শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারি।

২৮, শরৎ বোস রোড, ল্যান্সডাউন টেরেস্, কলকাতা
৯ই জুলাই, ১৯৬৭

এই যে রথযাত্রা উৎসব, তাতে আমরা কি দেখি? রথযাত্রা উপলক্ষ্যে একটা রথকে সবাই মিলে টানছে। দেবতা জগন্নাথ রথে বসে আছেন। তাঁকে সহস্র ব্যক্তি টানছে সহস্রধারাতে। এতে কি ইঙ্গিত দিচ্ছে? একসুরে একত্রিত হয়ে সবাই মিলে যদি কাজ করে, তবে সব কাজেই সফলতা লাভ করা যায়। **বাস্তবক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে রাজনীতিক্ষেত্রে— একসুরে কাজ করলে সবকিছুই সেই টানে আসে। যে চাকা চলে না, একবছর আটক থাকে; সকলের সমবেত ইচ্ছাশক্তির আগ্রহে একবছর পরপর সেই চাকা চলছে। সেই চাকাকে সবাই টেনে একধার থেকে আর এক ধারে নিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে টানলে সব নেতা একদিকে যাবে।** আমাদের কর্মজীবনে, বাস্তবজীবনে যদি সেইভাবে চলি, সেইভাবে যদি সবাই টানে, সবাই একদিকে থাকে, কত সুন্দর হয় বলতো? যে কোন নীতির সুরে সুরময় হয়ে, সবাই যদি একসুরে টানে অদ্ভুত অদ্ভুতভাবে ফলটা পাবে।

যেই ভগবানের ভগবদ্‌শক্তিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভরপুর হয়ে রয়েছে, সেই শক্তিকে কে টানছে? সমস্ত গ্রহগুলো, নক্ষত্রগুলো আপন আপন শক্তিতে, ঐ শক্তিকে টানছে। এই টানাটানির ফলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের আকর্ষণে, সমস্ত গ্রহগুলো আপন আপন কক্ষে থেকে চাকার মতো ঘুরছে। অগণিত গ্রহ চাকার মতন হয়ে যে ঘুরছে, কে টানছে? কর্মীরা টানছে। কর্মী কারা? অনন্ত কোটি গ্রহ নক্ষত্রপুঞ্জ চাকার মত ঘুরে ঘুরে, ভগবদ্ শক্তিকে টানছে, তারাই কর্মী। আর জগতের নাথ, জগন্নাথ যে বসে আছেন, কোথায় বসে আছেন? ঐ শূন্যে বসে আছেন আর

বলছেন, 'তোমরা সবাই আমাকে টানো।' টানছে কে? টানছে জনশক্তি, জীবশক্তি, অনন্ত অণুপরমাণুর সমন্বয় শক্তি। জীবশক্তি কিভাবে টানছে?

এই জীবশক্তির মনন শক্তি নিয়ে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ গড়া। **এই জীবশক্তির সমন্বয় সুর নিয়ে এই জগৎ গড়া। এই গ্রহগুলো সেই চৈতন্যশক্তিতে গড়া। তাই ঘূর্ণায়মান গ্রহগুলির চক্রও (চাকাও) সেই চৈতন্যশক্তিতে গড়া। গ্রহগুলো চৈতন্যে গড়া বলেই তাদের মন আছে, বুদ্ধি আছে, প্রাণ আছে।** কাজেই প্রত্যেকে নিজস্ব সত্তায় থেকে অন্যকে উপভোগ করে চলেছে। যার যার আন্তরিকতা বজায় রেখে তারা কি করছে? পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণে বেঁধে রেখে, গ্রহগুলি নিজ নিজ কক্ষে থেকে নিজস্ব গতিতে চলছে। দেবতা তার বারিধারা বর্ষণ করছে। চাতক পাখী তৃষ্ণা নিবারণকল্পে কি করে রয়েছে? চাতক পাখী হাঁ করে রয়েছে। তৃষ্ণা নিবারণ হয়ে যাচ্ছে। পূরণ হয়ে যাচ্ছে। শুধু হাঁ করে থাকলেই হবে না। পূরণের সুরে পূর্ণ হতে হবে। সেই পূরণের হাঁ, মহাশূন্যের গর্ভ থেকে ভরপুর হচ্ছে।

আমাদের এই গ্রহ, এই পৃথিবী গ্রহের যে চাকা, সে সজাগ। **পৃথিবী সজাগ আছে বলেই প্রতিটি মাটির কণা সজাগ। অগণিত কণা শক্তি দিয়ে, তাদের বুদ্ধি বৃত্তি একত্রিত হয়েই এই পৃথিবী গড়া।** বহু গতির সহিত যুক্ত হয়ে, গতিশীল হয়ে,গতিময় হয়ে আপনকক্ষে থেকে সে (পৃথিবী গ্রহ) নিজের গতিতে একটানে চলেছে। প্রত্যেকটি গ্রহ নিজ নিজ কক্ষে থেকে আপন চক্রে (চাকায়) আপনি ঘুরছে। প্রতিটি অণুপরমাণুর ইচ্ছা দিয়ে গড়ে উঠেছে এই জগৎ। সে (পৃথিবী গ্রহ) আপন কক্ষে ঘুরে ঘুরে কাকে টানছে? 'নাথ'কে টানছে। 'নাথ' কোথায়? 'নাথ' মহাশূন্যে; আবার দেহবীণাযন্ত্রের মূলাধার থেকে সহস্রারে। মন কি করলেন? মনন করে জীবজগৎ সৃষ্টি করলেন।

মাটি দেখে বুঝা যায়না, সে বুঝে কি না। বাতাস দেখে বুঝা যায় না, সে বুঝে কি না। পর্বত দেখে বুঝা যায় না, সে বুঝে কি না। তবে কে বুঝে? এই পরিদৃশ্যমান জগতের সমস্ত অণুপরমাণু, অগণিত শক্তি বুঝময় হয়ে গেছে। সেই অগণিত বুঝগুলোকে টেনে নিয়ে, সেই বহুরূপকে টেনে নিয়ে, অনন্ত গতির পথে গতিময় হয়ে আমরা চলেছি।

হে জগন্নাথ, তুমি বহুরূপ হয়ে গেছ, তোমাকে টানছি। তুমি বহুরূপে আবির্ভূত হও। আমরা তোমার সেই শক্তির দাস হয়ে যেন উপভোগ করতে পারি। তোমার রথের চাকা হয়ে যেন থাকতে পারি। তোমার চাকা হয়ে তোমার শক্তিকে যেন উপলব্ধি করতে পারি। এই যে অগণিত রূপ, পৃথিবীর বুকে চলছে যে বহুরূপ, তাকে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

তাই সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ কি করলেন? চক্রাকারে আবর্ত্তিত হতে হতে চক্ষের জল ফেলে বললেন, 'হে নাথ, হে জগন্নাথ, তোমায় বুকে করে, মাথায় করে টেনে নিয়ে, বহুরূপে দেখতে চেয়েছি। তুমি সত্যি বিরাট। আমাদের চাকা তোমার চাকা হয়ে থাক। তোমার চরণ আশ্রিত হয়ে, পদধূলি হয়ে থেকে, যেন তোমার সেবা করতে পারি।' মহাশূন্যের সমস্ত গ্রহ উপগ্রহের চাকাগুলো কি করলো? জগন্নাথের রথের চাকাগুলো কি করলো? তারা ভগবানকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অনন্ত জগতের সমন্বয় শক্তি নাথকে টানছে। সেই সমন্বয় শক্তির সুরে সব বাঁধা। নাথ তাঁর শক্তি বহুরূপে প্রকাশ করছেন। নাথ বলছেন, 'আমার রূপকে তোমাদের মাঝে ছেড়ে দিয়েছি। তোমরা অনন্ত রূপে আবির্ভূত হও। আমার শক্তিতে শক্তিমান হও।'

সেই মহাচৈতন্যের সুরে চৈতন্যময় হয়ে, প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই সেই চৈতন্যশক্তিকে প্রকাশ করছে। বলতে পার, সৃষ্ট বস্তু সমূহের জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তনের মাঝে, জগন্নাথের সেই রথের চাকাই যেন আবর্ত্তিত হয়ে চলেছে। তাই হে পথিক, অনন্ত পথের যাত্রিক, জীবনের চলার পথে, রোগ শোক, দুঃখ-ব্যথা, যাতনা ভরা জীবনের মাঝে নাথের, জগন্নাথের সেই অনন্ত শক্তিকে স্মরণ কর। অনন্ত গতির পথে গতিময় হয়ে, অনন্ত জগৎকে তিনি টেনে নিয়ে চলেছেন বিরামবিহীনভাবে। তাঁর সেই টানের মাঝে থেকে, আমরাও যেন তাঁকেই টানতে পারি, তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে থাকতে পারি। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সহস্র সহস্র বছরের সাধনা যেখানে লাগে, মহানের স্পর্শে সেখানে মুহূর্ত্তে হয়ে যায়। অল্পতেই সেই কাজ হয়ে যায়।

শরৎ বোস রোড, কলকাতা (ল্যান্সডাউন টেরেস)
৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭

প্রশ্ন— ঠাকুর, সবাইকে তো তুমি নিয়ে যাবে। যে জপ ক'রলো, তার কি হবে? আর যারা জপ করে না, তাদের কি হবে? আমার মতো যারা নাম করে বেড়ায়, তাদের কি হবে? এদের কি আলাদা আলাদা কোন র‍্যাঙ্ক হবে?

ঠাকুর— সবাইকে নেওয়া হ'ল। সবাই যাত্রিক। মনে কর, উঁচু জায়গা হতে হাঁটা পথে যত নদীর কাছে যাবে, দূর থেকে এসে তত সামনে জল পাবে। যে গাছ নদী থেকে দূরে থাকে, তার বেঁচে থাকতে গেলে, তার শিকড়গুলি সেইভাবে প্রবেশ ক'রে ক্রমশঃ ক্রমশঃ ভিতর দিকে চলে যায়। তাই কাছে যারা থাকে, অতি অল্পতেই জল পায়। আর দূরে যারা থাকে, তাদের জল জল করে কষ্ট পেতে হয়। কিন্তু সৃষ্টির দিক থেকে গতিকে যে আশ্রয় করে, সে আরও বেশী চলে যেতে পারে।

যিনি গতি দান করেন, প্রকৃতির গতির সাথে এক গতিতে যুক্ত করে দেন, তিনি গতিদাতা। **ইতিহাসের খাতায় যাঁরা দেবতা, অবতার, মহানরূপে বর্ণিত হয়েছেন, সেই যে বিরাট পুরুষ, যাঁরা পৃথিবীতে আসেন, তাঁরা অনেককে স্পর্শে মুক্তি দিয়েছেন; স্পর্শে অনুভূতি দিয়েছেন; কাউকে স্পর্শে সিদ্ধিলাভ করে দিয়েছেন; কাউকে স্পর্শের দ্বারা দর্শন করিয়েছেন। বিভিন্নভাবে এক এক জনকে এক এক আসনে বসিয়েছেন।** যত ফুল দেখ, সব ফুলই বাতাস চায়, আলো চায়, জল চায়। কোন কোন ফুল সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। তবে সব ফুল সূর্যের সাথে সাথে ঘোরে না। তার রকমারীটাও সেইরূপ হয়েছে। কিন্তু সূর্যমুখী ফুলের সব ফুলই সূর্যমুখী। সে সূর্যের মত সূর্যের সাথে সাথে পূর্বদিক

হতে পশ্চিমদিকে ঘুরছে। থাকেও সে অনেকদিন। আর এই ফুলটুল (গোলাপ, রজনীগন্ধা, জুঁই) অল্প সময়ে থাকে। এই একমুখী হওয়ার দাম আছে। জপ যারা করে, জপে যারা থাকে, এই একমুখী হওয়ার চেষ্টাতেই যেন নিবিষ্ট থাকে।

মহাদেব কার্ত্তিক ও গণেশকে বললেন, 'যাও, বিশ্ব ঘুরে এস।' কার্ত্তিক তো ছুটলো। আর গণেশ একটু মাথা চুলকিয়ে শিবকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে বসে রইল। শিব বললেন, ''ভারী দুষ্টু তুমি, গণেশ।''

—আমি তোমাকে তিনপাক দিয়ে ঘুরলাম। মহাদেবের পা টিপছে গণেশ তিন পাক ঘুরে। আর ওদিকে কার্ত্তিক ঘুরতে ঘুরতে স্পুটনিকের মত চলছে। এদিকে বাপের পদসেবা করছে গণেশ।

শিব বলছেন, ''তুমি বাপকা বেটা। তোমার পূজা হবে সবার আগে।''

সমস্ত কাজের আগে এই একমুখী অবস্থাটাই বড় কথা। পদসেবাটাই বড় কথা। এই যে বিরাট পুরুষ, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যাঁরা আসেন, তাঁরা ইঞ্জিন হয়ে লক্ষ লক্ষ জনকে টেনে নিয়ে যান। বিশ্বের সবাই ইঞ্জিন হতে পারে না। দশ লক্ষ বগী হলে, একশো, দুশো ইঞ্জিন হয়। কাজেই অত মেহনত করার দরকার নেই। **যে ব্যক্তি পঞ্চাশ বছর সাধনা করে একটা কিছু আবিষ্কার করলেন, এখন তোমরা শিখে নিয়ে সেটা ঘণ্টায় ঘণ্টায় বের করছো। তোমাদের ৫০ বছর নষ্ট করার প্রশ্ন নেই।** তুমি ধর, নিজে নিজে রেডিও বানানো শিখতে গেলে। সেই আবিষ্কারকের সাধনার মূল্য দিলে না। তোমারও তারের পর তার মিলাতে লাগলো ৫০ বছর। যিনি আবিষ্কার করলেন, তিনি বড় বৈজ্ঞানিক। আমাদের বাড়ীর কাছে জগদীশ বসুর বাড়ি। তিনি রেডিও আবিষ্কার করেছিলেন। সেখানে গিয়েছিলাম। মীটিং করে এসেছি। কেউ আবিষ্কার করে যা কিছু বের করেছেন, তুমি তা বের করতে যেও না। তুমি নতুন জিনিস নিয়ে আরম্ভ কর। তোমরা চর্চা করে বের করে নাও।

শ্রীরামচন্দ্র এলেন, শ্রীকৃষ্ণ এলেন। তুমি যদি রাম হতে চাও, তাহলে মুস্কিল হয়ে যাবে। তার চেয়ে হনুমান হওয়া ভাল। রাম

বললেন, "আমি যেখানে যাচ্ছি, তুমিও তো সেখানেই যাচ্ছ।" ছেলে বোম্বে যাওয়ার টিকিট নিয়ে ঘুরছে। তাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে না, 'টিকিটের টাকাটা কি তুমি রোজগার করেছ?'

কারণ বুঝা যায়, টাকা রোজগার সে করেনি। বাপের রোজগারে বোম্বের টিকিট পকেটে আসছে। সেইরূপ তুমি যখনই ইঞ্জিন ধরে বসেছ, ইঞ্জিনের সাথে সাথে বগীগুলিও সেই স্পীডে চলেছে। সে ইঞ্জিন না হতে পারে, কিন্তু তার গতির সাথে এক গতি। কেউ যদি বলে, 'ধুয়া খাব, নেশা করবো।' ইঞ্জিনের বয়লারের আগুন হয়ে ফুৎ ফুৎ করে লাভ কি?

তোমাদের ইঞ্জিন হওয়ার প্রয়োজন নাই। ইঞ্জিন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা হওয়া উচিত নয়। এখানে তোমরা সব করবে। ইঞ্জিনের তো সময় নাই, ছুটে চলেছে হু হু করে। আর তোমরা এখানে বসে ভোগও করছো, যোগও করছো। এই যে ভোগ করে যোগ করা, এটাই জীবলোকের চূড়ান্ত পথ। ভোগের ভিতর দিয়ে তোমাদের রাস্তা করে দিয়েছি। এই যোগাযোগটাই সর্ব অবস্থায় maintain করতে হবে। যা খুশী তাই করুক না কেন, যদি সর্বাবস্থায় মনে প্রাণে অন্তরে ধরে রাখতে পারে, সেই সত্যিকারের চরম যোগী।

অনেকে কি করে? ভোগের অবস্থায় আমার ফটো পর্যন্ত ঢেকে রাখে, 'এই ঠাকুর তো সব বুঝছেন।' পকেটের ফটো পর্যন্ত সরিয়ে রেখে দেয়। ভুল ত্রুটি সবসময় আছে। এই যোগাযোগটা, এই যোগসূত্রটা যে যতবেশী বেঁধে রাখতে পারবে, সে ততবেশী এগিয়ে যাবে। যত অল্প কাজই (জপ ধ্যান) করুক না কেন, এই যোগাযোগটা ঠিক রাখলেই হল। দেবতা যিনি আসবেন, সহজেই নিয়ে নেবেন। **এক নয়া পয়সায় গরুর গাড়ী বোঝাই করে, নিয়ে চলছে। আর একজন একটা ময়লা চেক নিয়ে চলছে ২০ কোটি টাকার। খুচরা টাকা নিলে এতে কয়টা গরুর গাড়ী লাগতো? ঐ যোগাযোগের যোগসূত্রে চেকের মত কাজ হয়। এই যোগাযোগে সহজে চলে যাবে। তারপর কি হয়? যোগাযোগ ঠিক রেখে যদি জপ করা যায়, অনেক উপকারে লাগে।**

ভিখারী এসে পয়সা চাইছে। তাহলে যদি ভাঙানি পয়সা থাকে,

দেবার সুবিধা হয়। দশ টাকা, পাঁচ টাকা থাকলে, ভিখারীকে দিতে পারছে না। আবার না দিয়েও কষ্ট লাগছে। কাজেই কিছু রেজ্‌গীরও (ভাঙানো পয়সা) দরকার হয়। কাজেই জপ হচ্ছে ওরকম তুলনামূলক খুচরো পয়সা। কারেন্সিতে (টাকশালে) যে এক পয়সা বানায়, যে এক টাকা বানায়, আবার যে হাজার টাকা বানায়, সে আরও বেশী এগিয়ে যাবে। প্রতিমুহূর্তে একে এক পয়সা হয়, একে এক টাকাও হয়। আবার একে এক হাজারও হয়। আবার যদি বল, জপ রাখবো ধ্যানে, আর ছিটিয়ে যাব নামে; যেমন মহাপ্রভু ছিটিয়ে গেছেন। জপ আর যোগাযোগ রাখতে সময় লাগে মাঝে মাঝে। যোগাযোগের অসুবিধা হলে জপ করে কি? যোগাযোগের সুবিধা করে। **জপগুলোর বল্টুর মত কাজ, বাঁধ (বাঁধন) ঠিক রাখার জন্য। আর যদি বল, 'আমার জপ তপ সব ঠাকুরের কাছে সঁপে দিলাম', তাতেও যথেষ্ট। আবার যদি যোগাযোগে থাক, সেটা, আর এক অবস্থা। কিন্তু যাঁরা আসেন মহান হয়ে, তাঁরা মাছি, মশা, যাই থাক না কেন, সব একটা বগীতে ভরেন।** ভরে করেন কি? সাথে সাথে নিয়ে যান। আবার এতেও নিস্তার নেই। গোলাপের কাঁটার মতো, মহানদের সাথে সাথে ম্যাসেঞ্জাররা আসে। হাস্‌না হানা কি সুন্দর ফুল, তাতে যেমন সাপ থাকে। মহাপ্রভুর স্ত্রী মারা গেল সাপের দংশনে, এই হাস্‌না হানা ফুল তুলতে গিয়ে। **সহস্র সহস্র বছরের সাধনা যাতে লাগে, মহানের স্পর্শে সেখানে মুহূর্তে হয়ে যায়। অল্পতেই সেই কাজ হয়ে যায়। এই যে আশীর্বাদ, এই ভালবাসা থাকলে, আর কিছু লাগে না।** ভালবাসা যখনই থাকবে, প্রেমের বিনিময় হবে। গুরু মহান খুশী থাকলেই যথেষ্ট। ভগবান রাম যাতে খুশী হন, হনুমান তাই করতো।

দেবতার সঙ্গে, মহানের সাথে ভক্তের যে যোগাযোগ, যে আদানপ্রদান, তাতে ঘূণ ধরায় ম্যাসেঞ্জাররা। এই বিদেহী শক্তিগুলো আড়াল থেকে সুপ্তভাবে দূতের মতো কাজ করে যায়। তারাও ভক্ত হয়ে প্রকৃতি থেকে এইটুকু আশীর্বাদ নিয়ে এসেছে যে, ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে, যে কয়জনকে ভগবানের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করতে পারবে, ভগবানের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে,

তাদের সাধনার সেই ফলটা তারা পেয়ে যাবে। মনে কর, কোন মহান ঠিক করেছেন, ১৯৬৭ সালে (এই ঘরোয়া ভাষণটি ১৯৬৭ সালে) দশ হাজার নেবেন। তখন বিদেহীগুলো (ম্যাসেঞ্জাররা) উঠে পড়ে লেগে যায়। সেই দশ হাজারের ভিতর যতগুলোর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারবে, সেই ফলগুলো তারা নিয়ে নেবে।

মনে কর, শাস্ত্রী একজন পরম ভক্ত। আরও ৫০ জন তাকে খুব ভালবাসে। বিদেহীরা বা ম্যাসেঞ্জাররা দেখছে, শাস্ত্রীকে কি করে সরানো যায়। শাস্ত্রীর সাথে যদি গুরু মহানের ভুলবুঝাবুঝি সৃষ্টি করিয়ে দেওয়া যায় এবং ভুল বুঝে শাস্ত্রী যদি সরে যায়, তবে তার সাথে সাথে আরও ৫০ জনও সরে যাবে। তাহলে ঐ ৫১ জনের সাধনার ফলটা তারা পেয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছ? এই যে ব্যাধি, এটাই বিদেহী শক্তি। যাতে উভয়ের মধ্যে ভুলবুঝাবুঝি হয়, তারা সর্বদা সেই চেষ্টা করে। সেইভাবে একটা বাঁধ সৃষ্টি করতে চায়। তবে দৈবশক্তিকে আশ্রয় তারা করবে না। সেই শক্তি তাদের নেই।

তোমরা একভূত, আর বিদেহীরা (ম্যাসেঞ্জাররা) আর একভূত। এই বিদেহীশক্তি একসময় প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছে। তুমি যদি টাকা নিয়ে যাও, ডাকাত সঙ্গে সঙ্গে যাবে। ধন থাকলে উপদ্রব আসবে। ধর, '৬৭ সালে দশ হাজার স্যাংশন্ হবে। তারা দেখে, কিভাবে সরানো যায়। ধর, তোমাকে ৫০ হাজার টাকা দিল। তোমার পিছনে ম্যাসেঞ্জার লেগে গেল। ধীরেন সরকারের বাড়ীতে বলু, বিশুকে বলি, 'মাড়ির দাঁতও নড়ে।' তারা চিৎকার করে উঠেছে, 'আমাদের ম্যাসেঞ্জার ফোর্স কিছু করতে পারবে না।' তাদের কিন্তু ম্যাসেঞ্জার আক্রমণ করবে, জানিয়ে দিলাম।

হয়েছে কি, ১৯৪৯ সালে ৫ হাজার টাকা দামের জমি (এখন ৮০ হাজার টাকা হয়েছে), একজনকে বলেছিলাম, 'ঐ জমি তোমাকে দিয়ে দেবো।' তখনই ওরা (বলু, বিশুরা) Dummy Paper এনে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছে। আমার দুই তিনটে সই নিয়ে গেল। সেই জমি ৬৭ হাজার টাকায় বিক্রি করেছে। আরও ৪/৫ বিঘা জমি আছে। ৮০

হাজার টাকার লোভে মুহূর্তে মাথা ঘুরে গেল। আমি আইনের খাতায় ধরা পড়ে গেলাম। ওই ম্যাসেঞ্জার তাদের টাকা দিয়ে সরিয়েছে। এতটা যে হবে, ওরাও ভাবেনি। দেখেছ ত? বলু আর বিশু একেবারে ঘরের, কত আপনজন ছিল। আবার এক একজনকে লক্ষ টাকা দিয়েও বিগড়াতে পারে না।

ম্যাসেঞ্জারের সঙ্গে যে কোন ভক্ত, যে কোন লোক লড়াই করতে পারে। যে কোন দিক থেকে মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সন্দেহ আসতে পারে। সেই দিক দিয়েই তারা চেষ্টা করে। এই অবস্থা সব কালেই ছিল। শ্রীকৃষ্ণকে ভুল বুঝে অর্জুন বাড়ি বসে আছে। কৃষ্ণ এদিকে যায় তো, অর্জুন আর একদিকে। কৃষ্ণ নিজে গিয়ে অর্জুনকে বলে, ''কেন তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ?'' অর্জুন বলছে, 'তোমার এতবড় ভক্ত। তার ছেলেটা মারা গেল।' পরম ভক্তিভরে সে গুরুকে (শ্রীকৃষ্ণকে) জায়গা দিয়েছিল। গুরু তো নয়, যেন শত্রু। আমাদের কত যত্ন করে খাওয়াল। তোমার কাছে বর চেয়েছিল। কি বর দিলে? কি দিলে তুমি তাকে? তুমি বললে, ''৭ দিনের মধ্যে তোর পোলাটা (ছেলেটা) মারা যাবে।'' তার ছেলেটাকে মেরে ফেললে? অর্জুন বলছে, 'আমাকেও কোনদিন মেরে ফেলবে।'

তখন সেই ভক্তকে ডাকা হ'ল। সে একটুও দুঃখিত না হয়ে, শ্রীকৃষ্ণকে বললো, 'প্রভু, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।' অর্জুন শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। কৃষ্ণ অর্জুনকে বললো, ''অর্জুন, তুমি তো জ্ঞানী। আমাকে কি তোমার মূর্খ বলে মনে হয়? এত সেবা-যত্ন যদি কেউ শত্রুকেও করে, সে কি এরূপ করতে পারে? আমি জ্ঞানী, বিজ্ঞ হয়ে কেন এমন করলাম? আমার মাথাটা কি খারাপ হয়েছে? যে আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসছে, তার প্রতি এরূপ ব্যবহারের কারণ কি? আমাকে একটুও জিজ্ঞাসা না করে উত্তর দক্ষিণে হাঁটাহাঁটি করছো? একটু শোন, **ওর এই একটি ছেলে থাকলে, ওকে ২০ হাজার বার জন্ম নিতে হবে এবং প্রত্যেক জন্মে দুই একটা করে সন্তান মারা যাবে। কাজেই একজন্মে একটি সন্তানের মৃত্যুশোক চাও? না, ২০ হাজার জন্মের প্রত্যেক জন্মেই দুই একটি করে সন্তানের মৃত্যুশোক চাও?**'' তখন সেই ভক্ত

বলছে, 'না, না। আমি একজন্মেই পুত্রশোক পেয়ে মুক্তি পেতে চাই।'

কৃষ্ণ বলছে, ''অর্জুন, আমি ডাক্তার। আমার কাছে যন্ত্র আছে। তোমাদের জীবনটা কবিরাজের উপর নির্ভর করছে। তার কথায় ঔষধ খাচ্ছ। আর আমি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সৃষ্টি করি। আমার কথা শুনবে না?''

এইবার অর্জুন নিজের ভুল বুঝতে পেরে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চাইল। অর্জুন তখন গিয়ে সবাইকে ডেকে আনলো। সবাই শ্রীকৃষ্ণের কাছে এসে এইরূপ ব্যবস্থা চাইলো, 'আমাদের দু'একটা ছেলে মারা যাক। আমাদের উদ্ধার করে দিন।'

শ্রীকৃষ্ণ বললো, না, ''এভাবে তো নয়। আমার জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে দেখলাম, এই এক ছেলের জন্য এর জীবনটা আটকে আছে। কাজেই এই অভিশাপ থেকে ওকে মুক্ত করলাম।'' সকলের জন্য সেটা করা সম্ভব নয়।

এত রোগ অশান্তি আসে। কতগুলি সেরে যায়। আবার কিছু কিছু আছে, যেটা অল্পে সারিয়ে দেওয়া হয় না। সেই দুঃখ দিয়ে যদি এতবড় বিরাট দুঃখ দূর করা যায়, সেই চেষ্টা করা ভাল নয় কি? এখন না বুঝলেও পরে বুঝবে। তখন তুমিই এসে বলবে, 'প্রভু, তুমি তো বুঝতে। কেন তুমি এরকম করলে?' রোগীর বকাবকিতে ডাক্তার চটে না। যত ব্যথা-যন্ত্রণাই হোক, গালি খেয়েও রোগীকে ছেড়ে দেয় না। রোগী পরে ভাল হয়ে গেলে বলে, 'ডাক্তারবাবু, আমি অন্যায় করেছিলাম। কিছু মনে করবেন না। আমি আপনাকে গালি দিয়েছিলাম।'

এই দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়ে হাজার হাজার জন্ম পার করে দেওয়া যায়। সব রোগের জীবাণু কি দেখা যায়? রক্তের ভিতর দিয়ে কত জীবাণু দৌড়াদৌড়ি করছে। খালি চোখে কোন্ germ দেখা যায়? যন্ত্র দিয়ে দেখা যায়। আবার অনেক রোগের জীবাণু যন্ত্র দিয়ে দেখা গেলেও, সব রোগীকে তা দেখানো যায় না। নিয়ম হচ্ছে, সব ভক্তকে অনুভূতি দিয়ে আর একজন্ম যদি দেখাতে হয়, তবে দেখানোই সার হবে। কাজ হবে না কিছু। কাজেই **মহানরা যাঁরা আসেন, জীবনের পর জীবন যে চলছে, সাধারণ সাধারণ দুঃখের ভিতর দিয়ে বৃহৎ দুঃখ কাটিয়ে পার**

করে দেন। সবাই তো মৃত্যুর খেলা খেলছে। এই জগৎটাতে মৃত্যুর নৃত্য চলছে। মৃত্যু হয়ে গেছে সবার। এখন সাজ সরঞ্জাম চলছে। যদি বুঝতাম, না, মরবে না। তাহলে কথা ছিল। তাতো না। যেখানে মৃত্যুটাই একটা ধর্ম, কেহ ৫ বছর আগে, কেহ ৫ বছর পরে; যাবে তো সবাই।

ঢাকার শান্তিনগরে একজনের পর পর আটটি ছেলে মারা গেছে। এক সাধু বলছে, ''তোর ঘরের কাছে বালক বেশে এক ব্রহ্মজ্ঞ আছেন। তার কাছে যা।''

ঢাকার বলধার চৌধুরী, প্রায় ১ কোটি টাকার বই কিনেছে, পড়েছে, হজম করেছে। পৃথিবীর মধ্যে ১৩ জন গাছপালা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ইনি একজন। বহু সাধু-সন্তদের সঙ্গ করেছে। নিজে নাটক লিখে নাটক করতো। সেই বলধার চৌধুরী নিগমানন্দকে ডেকে এনেছে তার বাড়ীতে।

তিনি বললেন, 'তুমি বড় সাধক। তোমাকে আমি দীক্ষা দেব না।' ভোলা গিরিও যেতেন সেখানে। একটি মেয়ে তাকে বলেছে, 'এক বাচ্চা মহান আছেন কোম্পানীর বাগানে।'

বলধার চৌধুরী লোক পাঠালো কোম্পানীর বাগানে। আমাকে বলছে, 'বাবু আপনাকে ডেকেছে।'

—বাবুকে বলগে এখানে আসতে।

সে গিয়ে চৌধুরীকে বলে, 'বাচ্চা বড় দাম্ভিক।' তারপর বলধার চৌধুরী নিজে এসেছে। আমাকে বলে, 'আমি লোক পাঠিয়ে অন্যায় করেছি।'

আমি—কি বুঝতে চাও?

সে—শাস্ত্র বুঝতে চাই। যদি দয়া করে আমার বাড়ীতে আসেন।

আমি—চল।

সে আমাকে নিয়ে গেছে। দেখি, বড় বড় পাখা দিয়ে সুন্দরী মেয়েরা বাতাস করছে। সে (বলধার চৌধুরী) আমাকে বলে, 'আমি

অনেক সাধুদের সঙ্গে আলাপ করেছি।

নিগমানন্দ, ভোলাগিরি সবাই বলেছে, ''তুমি খুব জ্ঞানী। তুমি খুব বোঝ।'' আমি যেটা বুঝি, সেটাই কি ঠিক? না, আরও কিছু আছে?'

আমি—তুমি কিছুই বোঝ না।

সে—কিছুই বুঝি না?

আমি—না। **তোমাকে যদি ২০ লক্ষ বছর বাঁচিয়ে রাখি, তাহলে কত লক্ষ মণ চাল ডাল খাবে?** (খাতা পেন্সিল নিয়ে হিসেব করতে বসে গেছে।) **পৃথিবীর এক বছরের চাল খেয়ে ফেললেও তোমার খাওয়া শেষ হবে না। তারপরও বলবে, 'আরও চাই।' কাজেই তুমি ক্ষুধার্ত্ত। এই অনন্ত বুঝের কিছুই তোমার বুঝা হয় নাই। তুমি ক্ষুধার্ত্ত। তুমি বুঝে গেলেও ভরপুর হও নাই। বুঝ যখন আসবে, তখন ভরপুর হয়ে যাবে। এখন তুমি বুঝের ক্ষুধার্ত্ত।**

সে—এভাবে তো এতদিন চিন্তা করি নাই।

আমি—এখনও তোমার দাঁত ওঠে নাই। দাঁত উঠবে যখন, তখন solid খাবার চাই। দাঁত উঠলে স্তনে কামড় দেবে। তোমার দাঁত উঠে নাই। এখনও মধু চুষছো।

সে—এভাবে তো কেউ ঘাড়ে ধাক্কা দেয়নি। এরকম করে তো কেউ বলেনি।

আমি—হ্যাঁ, ঘাড় ধাক্কা। তারপরে কানে ধরতে হবে। কানে ধরা হচ্ছে, **যত ভূলোক, ভবলোক, মহলোক, জনলোক, সত্যলোক, তপোলোক—সমস্ত লোক এই ধরা দিয়ে, এই ধ্বনির মন্ত্র দিয়ে, এই নাদধ্বনি দিয়ে pass করছে। এই ধ্বনি ঢালাই করে এই জগৎ হয়েছে।** নিদাঘের রাগে জল যখন উপরে উঠে, তখন তো দেখ না। আগে গর্জন, তারপর বর্ষণ। (শুঁড়) দেখেছ? আগে ধ্বনিটা, তারপর শিলা পড়ছে। আর যখন শিলা পড়ছে, যত শিলা পড়ছে, ফাটাফাটি হবেই। আমাদের দেশে বলতো, শিব আর পার্বতীতে লাগছে ঝগড়া। তাতেই শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। তোমার সেই নাদের ধ্বনি জানা হয় নাই। তোমার এখনও দাঁত

উঠে নাই।

সে—দাঁত উঠে নাই?

আমি—এত গ্রন্থ পাঠ করেছ। কিন্তু পাঠ করলে কি হবে? পিণ্ডিতো চটকাতে পারলে না।

সে—তাহলে আমায় কি করতে হবে?

আমি—এই আকাশ ফাঁকা। তুমি যা করেছ, সব ফাঁকা। যারা গ্রন্থ লিখেছেন, কাল্পনিক; টীকা, উবাচ ভাষ্য আর গোলকধাঁধায় ঘুরে মরা।

মনে কর, দশজন অন্ধ যদি এক জায়গায় থাকে, তারা কি গ্রন্থ লিখবে? আর এক অন্ধ যদি সেই বই পড়তে চায়, কি বুঝবে? গোঁফের স্পর্শে যে জীব চলে, বিড়াল রাত্রে চলে। গোঁফের স্পর্শে অনেক জন্তু চলে। স্পর্শে শুধু গা বাঁচিয়ে চলা যায়, এতে কি জগৎকে উদ্ধার করতে পারে? লাঠি দিয়ে দিয়ে চলেছে অন্ধ। দরজার গর্ত্তে পড়েছে, আর বলে উঠেছে, 'মাগো, একটি পয়সা দাও।' তোমার কথা হল কি, তুমি যতগুলো বই পড়েছ, সব বই অন্ধের। একজনও প্রত্যক্ষদর্শী নেই। ধারণা দিয়ে গ্রন্থ তৈরী করা; সেই ধারণার কথাই লিখেছে তারা। কল্পনার জগতে অনেক মিষ্টি কথা লেখা থাকতে পারে, কিন্তু তাতে পেট ভরে না। তাতে কি হয়? ক্ষুধার সময় যে চা খায়, তাতেই যা হবার হয়। তুমি পাঠ করে সব শিখেছ। কিন্তু এক্ষেত্রে যে বিষয়বস্তু দরকার, তাইতো নেই।

সে—আমার মধ্যে কিছুই কি নেই? তবে এতদিন এত লোকের সঙ্গে যে আলাপ হয়েছে, এত মহানরা বলে গেলেন, 'তোমার সব হয়ে গেছে,' সেসব কথার কি কোন মূল্য নেই?

আমি—দেখ, **ডাক্তার বুঝেছে, দু'চার দিনে রোগী মরবে, তবুও যেমন ভাল ভাল জিনিস খেতে বলে, ঠিক তেমনই যত মহানরা এসেছেন, তুমি তাদের খুব খাতির করেছ, তাই তারা আশার বাণী দিয়ে গেছে, যাতে আরও একটু এগিয়ে যাও, ভরপুর হও। আর আমি কাঠখোট্টা লোক। খাড়া খাড়া কথা বলি। তবে ক্ষুধার পাত্রটা বড়**

আছে। অনেক কিছু ভরবে। কিভাবে ভরবে?

সাগর দেখছ তো? তার মধ্যে কি অপূরণ আছে? সাগর দেখলে কি বুঝা যায়, তার ভরতে বাকী আছে? দেখে মনে হয়, সে ভরপুর; একটা আভিজাত্য আছে। কিন্তু সেটা তো ছয় সাত মাইল গর্ত্ত। দুই চার পাঁচ সাত আট মাইল গর্ত্ত কাটাতো সম্ভব নয়। সাগরের Depth, হিমালয়ের মতো গর্ত্ত করে কাটা, কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সেটা যখন হয়েছে, ভরবার জন্য হয়েছে। এই গর্ত্ত যখন হয়েছিল, তখন পৃথিবীতে জল হয়নি। পরে এই যে পাহাড় হতে জল নামতে আরম্ভ করলো, তখন উথাল পাথাল হয়ে পাত্র ভরতে শুরু করলো। খালি পাত্রটা যখন আছে, ভরার কাজটাও শুরু হলো। কিন্তু এমন পাত্রের পাত্র, যা পূরণ করা যায় না। আবার সৃষ্টির নিয়মও এমন, পাত্র যখন আছে, তখন ভরার ব্যবস্থাও আছে। যেটা ভরার দরকার ভরছে, আবার খালি হচ্ছে। এখানকার কোনও ইন্দ্রিয়ের চাহিদার দ্বারা ওটা ভরা যায় না। মনে হয়, শুধু ভরলো। কিন্তু ভরে না। মনে হয়, পেটটা ভরলো। আবার দু'বার হিসি করলেই পেট খালি। কাজেই পাত্র যখন সৃষ্টি হয়েছে, ভরবে। ভরেছে তার প্রমাণ এই ভূলোক, এই মানচিত্র। **স্রষ্টার সৃষ্টিতত্ত্বের মানচিত্র এই পৃথিবী। এই জাগতিক মানচিত্রই হচ্ছে, দেহগত মানচিত্রের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত।**

এই জল, মাউন্টেন হতে এই যে fountain বয়ে চলেছে, অবিরাম অবিরত; এই জল কোথা হতে, কোন্ অজানা হতে বয়ে আসছে?

তখন বলছে আমাকে, 'আপনি ভরপুর লোক। আপনি তো ভরপুর করতে পারেন।'

আমি—এখনো তো পাই নাই। এখনো তো কিছুই হয় নাই। এখনও তো বাড়ির বাইরে যাই নাই।

এইভাবে হ'তে হ'তে চার ঘণ্টা আলাপ। তারপর গাড়ি পাঠিয়ে পরপর সাতদিন নিয়ে গেছে। তারপর লম্বা হয়ে পড়ে বলে, 'আমার কানে দিয়ে দিন।'

তখন ঢাকার 'চাবুক' পত্রিকায় উঠলো, 'জগাই মাধাই পায়ে পড়েছে।' এই পত্রিকা কোনদিন কারও প্রশংসা করে না। সেখানেই উঠলো। আর "East Bengal Times," তাতেও বেরিয়েছিল।

আর একদিন ভরপুরের সম্বন্ধে বলবো। কাজেই **পাত্র যখন আছে, তখন ভরবেই। আজ হোক, বিশ লক্ষ কোটি বছর পরেই হোক, ভরবেই। কিন্তু দেবতারা যখন আসেন, রেফ্রিজারেটরে যেমন জল হয়, আকাশ থেকে, শূন্য থেকে ভরপুর করে দেবেন। মহানের স্পর্শে যে ভরপুর হয়, এই স্পর্শ হচ্ছে যোগাযোগ।**

আজ দেশের যে পরিস্থিতি, যে অভাব অভিযোগ, এটা অভাব নয়। পাঁচ টাকা করে কিলো নিয়ে, তোমায় পাঁচ হাজার মন চাল দিতে পারি, এত চাল আছে। তবে অভাব হয় কেন? জাহাজ এক কাত হলে ডুবে যায়। যাদের প্রচুর আছে, তারা আটকে রেখেছে। আমি মেঘনা নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছি, ঝড়ে সব এক কাত হয়ে আসছে। আমি বলছি, "আপনারা সব ঠিক থাকেন। ষ্টীমার এক কাত হ'তে দেবেন না। তবেই ষ্টীমার বেঁচে যাবে।" কাজেই সবার সমশক্তি একসুরে থাকলে কোন অভাব থাকতে পারে না।

এক একটা কাঠি নিয়ে নিয়ে কাক কি সুন্দর বাসা তৈরী করে। বাবুই পাখী উড়ে উড়ে কি সুন্দর বাসা তৈরী করে। **সৃষ্টির নিয়মে পৃথিবীর বুকে যতটা স্তন আছে, তার অতিরিক্ত সৃষ্টি হতে পারে না।** কিন্তু পৃথিবীর লোক সংখ্যা কত বাড়ছে। বাড়ুক, ক্ষতি নাই। আজ বুদ্ধি বাড়ছে। বিদ্যা বাড়ছে। সবচেয়ে ক্ষতি করছে কারা? যারা অর্থবান। এরা দেশকে মেরে ফেলতে চেষ্টা করছে।

সরকারের সবাই তো মানুষের জাত নয়। আমাকে বার করতে দিক। একদিনে লক্ষ লক্ষ মণ চাল বার করতে পারি। সব একদিনে ঠাণ্ডা করতে পারতো। নাবালকের হাতে শাসনভার পড়লে যা হয়। ব্রিটিশ নমস্য। তারা বরফ কেটে শস্য উৎপাদন করে। আর এদেশে শুধু ছিটালে (ছিটিয়ে গেলে) হয়। আমরা চিৎকার করি। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি না। দেশটায় আগুন লাগাতে চেষ্টা করছে। আমরা পারি বকবক

করতে। কিন্তু প্রকৃত কর্মীর অভাব। প্রত্যেকে ক্ষেতে নেমে যাও। এক ইঞ্চি জমি বাদ দেবে না। কত অনাবাদী জমি পড়ে আছে। দেখবে, নিমেষে সব বেঁচে যাবে। সব অভাব দূরে হয়ে যাবে। চাল শুধু নয়। তরকারী খেয়ে মানুষ বাঁচে। কুমড়ো খেয়ে বাঁচতে পারে। আলু খেয়ে বাঁচতে পারে। আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেকের ঘরের চাল ভরা কুমড়ো। কি সুন্দর।

এই সরকারের আদেশ দেওয়া উচিত প্রত্যেককে ক্ষেতে নামবার জন্য। **আমরা শহরের দিকে নজর দিই। আমরা ফ্যাক্টরী উদ্বোধন করি। কিন্তু জমির দিকে, কৃষকের দিকে তাকাই না। কৃষকের দিকে না তাকালে দেশ দাঁড়াবে না। যেই গাভী দুধ দেয়, সেদিকে দেখি না। জল আর ক্ষেত—এই দুইয়ের ব্যবস্থার দিকে নজর দিতে হবে।** এই যে হাজার হাজার টাকা খরচ করছে, জায়গায় জায়গায় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। বুঝে বুঝে টাকা খরচ করা উচিত। যেই জল উপর থেকে পড়ছে, তাতেই যথেষ্ট। সেই জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

সকলেই ক্ষেতে নেমে যাও। দেখবে, দু'এক টাকা চালের কেজি হয়ে যাবে। ফেলে ছড়ে খেতে পারবে। আজ এক ভরি সোনার চেয়ে জমির দাম বেশী হয়ে গেছে। নিজেরা ইচ্ছে করে দুঃখ সৃষ্টি করছি। সব ক্ষেতে নাবুন। সব ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

আমি কুমিল্লা ডিষ্ট্রিক্টে যখন ছিলাম, একবার তিতাস নদীতে এত কচুরী পানা হ'ল যে, যত জমি সব নষ্ট করে দিচ্ছে। আমি তখন স্কুলে পড়ি। এই সময় গান্ধীর আন্দোলন চলছিল। জাতিতে জাতিতে ঝগড়া ছিল। ব্রাহ্মণ মানবে না। জাত মানবে না। চরকা নিয়ে আন্দোলন চলছিল। আমি সকলকে ডাকলাম। অনেক নমঃশূদ্র আমায় ভালবাসতো। আমি নমঃশূদ্রদের ডাকলাম। ধমক দিলাম। সবাইকে বললাম, ''আগে কচুরীপানা টান। দেশের ক্ষেত তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কচুরীপানা ধ্বংস কর।'' সবাই রাজী হলো। এরজন্যই ঝগড়া লেগেছিল। পরদিন হাজার হাজার মানুষ একত্রিত হলো। অর্ধচন্দ্রের মত নদীটা। প্রায় ১৫ মাইল হবে। লাইন দিয়ে দাঁড়ালো সবাই। সবার সমশক্তিতে হাজার হাজার

মানুষ নদীটাকে ঘিরে, টেনে টেনে কচুরীপানা পরিষ্কার করতে লাগলো। এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টার ভিতর সব সাফ। এস.ডি.ও. আসছে। মীটিং করছে। আমাকে এসে বলে, 'এত সুন্দর কাজ করেছেন আপনি'।

—আমি একা নই। সবাই এক সাথে কাজ করেছে।

সে—আপনার জন্য একটা মালা এনেছি।

আমি সাধারণ ঘরের বাচ্চা। আমার উদ্যোগে যদি এই হয়, সকলে যদি জলে নামেন, সব সমাধান হয়ে যাবে। আমাদের রাজা জলে নামতে জানে না। অপরকে নাবিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। সব লোক খাটতে রাজী আছে। তবে কমিটি করে কাজ হয় না। আইন পাশ করলে সবাইকে যেতেই হবে। ধর, যাদের ৬০ বছর বয়স, তাদের বাদ দেওয়া হবে। আমিও যাব। হাজার হাজার কৃষক আসতো আমার কাছে। ট্রামের স্যাংশন এনেছে। গড়ের মাঠে কয়েক লাখ লোককে নিয়ে মীটিং করলো, ফাঁকা বস্তু। উদারতার অভাব— স্বার্থ; শুধু দলের স্বার্থ। আবার দলের মধ্যে খাওয়া খাওয়ি।

একটা উদর পৃথিবীর, গ্রীবা দুইটি—দুইমুখে দুইজন কথা বলে। একমুখ বলে, 'আমি মিষ্টি খাব, ফল খাব।' আর এক মুখ বলে, 'আমি বিষফল খাব।' 'আরে ব্যাটা, তাইলে তো, তুইও মরবি, আমিও মরবো। কারণ উদর তো একটাই।' যুক্তফ্রন্টের একটা উদর, দশটা মুখ। যা করিস্ না কেন, এক উদরে সব তো যাচ্ছে। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

খুব সাধারণের মতো তোমাদের সাথে মিশি বলে, তোমরা এখন আমাকে বুঝে উঠতে পারছো না।

১৫৫, পার্কষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৭
১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭

[ঘরোয়ানা পরিবেশে পার্কষ্ট্রীটের বাড়ীতে কয়েকজন আবাসিকের সামনে জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কথা প্রসঙ্গে একান্ত ব্যক্তিগত ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই তত্ত্ব আলোচনা করেছিলেন। সকলের অবগতির জন্য সেটিই যথাসম্ভব যথাযথভাবে তুলে ধরা হ'ল।]

আমি আমার মনের কথা তো সব খুলে বলতেই পারি না। যে জায়গা থেকে আমি এসেছি, সেখানকার কথা প্রাণভরে বলার মতো, লোকই পাই না। আমার কথা যথার্থভাবে বুঝবে, এরকম কাউকে পেলে আমারও খুব তৃপ্তি হতো, তোমাদেরও সুবিধা হতো। এমন কারুর সাথে কথা বলে, আমার তত্ত্বটা বুঝে নিতে পারতে। এখন এটাই বুঝেছি যে, আমাকে বুঝতে পারবে, এরকম লোক আমাকেই তৈরী করে নিতে হবে। **এখানে বেশীরভাগ কথা যে আমি বলি, সবই যার যার মাত্রা অনুযায়ী।** কেউ হয়তো মূর্ত্তিপূজা করতে ভালবাসে, আমার কাছে অনুমতি চাইতে এসেছে। তাকে বললাম, 'মূর্ত্তিপূজা করো'। আবার পরমুহূর্ত্তেই অন্য আরেকজনকে বলছি, 'মূর্ত্তিপূজা করে কি হবে?' সেদিন বৃন্দাবন থেকে শ্যামামায়ের (পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরের একান্ত অনুগত ভক্ত) ভক্ত যারা এসেছিল, তারা যখন কৃষ্ণ সম্পর্কে জানতে চাইলো, তাদেরকে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কত কিছুই জানালাম।

আবার ঐ যে কি নাম যেন, চন্দননগর না ঐদিকে থাকে, পার্টি করে—আমার কাছে আসে মাঝে মাঝে, হ্যাঁ হ্যাঁ রাম চ্যাটার্জী, আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কৃষ্ণের বলা গীতার ঐ শ্লোকটার ব্যাপারে। ঐ যে যুগে যুগে সাধুদের রক্ষা করতে আসবে। কি যেন শ্লোকটা?

ভক্ত—আজ্ঞে, বলছি—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।। ৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।। ৮
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, জ্ঞানযোগ, ৪র্থ অধ্যায়

ঠাকুর—হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই শ্লোকটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। আমি ওকে (রাম চ্যাটার্জীকে) বললাম—বেদের যুগের বড় বড় ঋষিরা কৃষ্ণের সময়ে থাকলে, এই কথা বলার জন্য কৃষ্ণকে চরম শাস্তি দিত। কারণ এই শ্লোক মানুষকে দুর্বল করে দেবে। **মানুষের উপর যখন অত্যাচার হবে, তখন যদি সে তার প্রতিবাদ, প্রতিরোধ না ক'রে কৃষ্ণের আশায় বসে থাকে, তাহলে তো মানুষ দুর্বল হয়ে পড়বে, সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে। কৃষ্ণের আশায় বসে থেকে থেকেই সমাজের আজ এই দুরবস্থা।** যদি কৃষ্ণ এইভাবে বলতো যে, 'যখন অত্যাচার হবে, তখন আপনারা হাতের সামনে হাতা, খুন্তি যা পাবেন, তাই নিয়েই নেমে যাবেন। এই হাতাওয়ালা, খুন্তিওয়ালাদের সাথেই আমি থাকবো,' তাহলেও একটা নম্বর দেওয়া যেত। রাম চ্যাটার্জী যাওয়ার সময় বলে গেল, 'আপনার মতো নাস্তিক, পৃথিবীতে দুটো আছে কি না সন্দেহ।'

সমস্যাটা শুরু হয় কখন? যখন বাইরে গিয়ে, রাম চ্যাটার্জীর সাথে ঐ বৃন্দাবন থেকে আসা ভক্তদের মধ্যে কথা হবে। একজন বলবে, 'ঠাকুর কৃষ্ণ মানেন।' আরেকজন বলবে, 'মানেন না।' যারা নাস্তিক বলে নিজেদের ভাবে, তারা রাম চ্যাটার্জীকে বলা কথাটায় খুশী হবে। আবার যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তারা কৃষ্ণের মাহাত্ম্যের কথা শুনে আনন্দ পাবে। একইভাবে কৃষ্ণ অনুরাগী যারা, তারা যদি গীতার শ্লোকের ব্যাখ্যাটার

কথা শোনে, তাহলে মনে মনে খুবই ব্যথা পাবে। হয়তো আর কোনদিনই আমার কাছে আসবে না। এখন বোঝ আমার অবস্থাটা।

এইভাবে **সবার মন রাখতে গিয়ে আমার ভিতরের সত্যিকারের চিন্তাটা যে কি চলছে, তা আর বলা হয়ে উঠছে না। তবুও এত প্রতিকুল পরিস্থিতির মধ্যেও যা দিয়ে চলেছি, তাতেও আমার Original চিন্তা ভাবনার প্রচুর আভাষ রয়ে যাচ্ছে।**

যে বীজ তোমাদের দান করা হয়েছে, সেই বীজ যেদিন ফুটে উঠবে, সেদিন তোমরা প্রথম উপলব্ধি করবে যে, তোমাদের বাবা এতদিন তোমাদের তালে তাল দিয়ে চলেছেন। কিন্তু হওয়া উচিত ছিল উল্টোটা। তোমাদেরই আমার সুরে সুর মিলিয়ে যাওয়ার কথা। তোমাদের ভিতর থেকেই সেদিন ব্রহ্মের বাণী ফুটে উঠবে। আমি আজ ক্লান্ত। ধীরে ধীরে জীবনের সূর্য মধ্যগগন থেকে পশ্চিমের দিকে ঢলে পড়তে শুরু করেছে। রাত্রিবেলা শুতে পারি না, আমাকে বসিয়ে রাখে। দুইদিন আগে এক অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। আমার কাছে কোনকিছুই অদ্ভুত না। তোমাদের মতো করে বলতে গিয়ে, অদ্ভুত শব্দটা বললাম। রাত্রি বেলা বিশ্বপ্রকৃতি থেকে একটা অনুরোধ আসলো। খুব ছোটবেলায় যখন কাজে বসতাম, তখন এমন কেউ কেউ আসতো। হঠাৎ দেখি, তারা সেদিন এসে হাজির। এসে প্রণাম জানিয়ে বললো, **"আপনি যদি খুশী থাকেন, তবে আপনার কাছে একটা অনুরোধ আছে। আপনার মতো তিনজনকে তৈরী করতে হবে।"** এইটুকু বলেই চলে গেল।

প্রশ্ন—আজ্ঞে, আপনি কৃপা করে, এবিষয়ে একটু বুঝিয়ে বলবেন?

ঠাকুর—এই কথা আমার ঘরানার কথা। এটা কাউকে বুঝানোর জন্য নয়। কারণ বুঝ পাকা না হলে, অনেক রকম বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা নিজেরাই করে বসে। সেদিন নমিতা এসে জানতে চাইলো, আমি 'ক' কে Organization-এর অমুক বলেছি কি না। সেদিন নর্থবেঙ্গল থেকেও একজন চিঠি লিখে, এই প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছে। যেখানে কেউ কাউকে মানে না, সেখানে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা রাখার জন্য, আমাকে অনেক কথা

বলতে হয়। এখন আমি যদি বলি যে, এই কথা আমি বলিনি, তাহলে কাল থেকে 'ক' কে কেউ মানবে না। আবার বেহালা থেকে আসে 'খ' আমাকে বললো, 'ক' কাছে থাকলে, ওর নাকি অনেক উপকার হয়। আমি বললাম, 'বেশ।'

কারুর বিশ্বাসে আমি সাধারণতঃ আঘাত করি না। তবে কেউ যদি আন্তরিকভাবে জানতে চায়, তখন অনেক সময় কিছু কিছু কথা খুলে বলি। মানুষ নিজের চিন্তা অনুযায়ী আমাকে বিচার করে। সেই অনুযায়ী তার মনের মতো কথা হলে খুশী হয়। আবার একটু অন্যরকম কিছু শুনলে দুঃখ পায়। কিন্তু আমার মনের একান্তের কথাটা, কেউ জানতে চায় না। যার যার নিজের বুদ্ধিটাই সবসময় কার্যকরী করে চলে। নিজেরাই কিছু একটা বুঝে নিয়ে, তৃপ্তি নিয়ে চললো। কোন সময় ভুল ধরিয়ে দিলে, আবার একটা নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে এসে, তার কাজের সমর্থনে যুক্তি দেখায়। কিছুতেই সেই সহজ সরল স্বচ্ছ মন নিয়ে, দাঁড়াতে চায় না। আমি সেই বুঝের মাঝে হাত না দিয়ে, অপেক্ষা করতে থাকি সেই বীজ ফোটার জন্য, যেদিন আমার সত্যিকারের মনের কথা, তাকে জানাতে পারবো।

কি কঠিন পথ দিয়ে যে আমি, সেই শিশু বয়স থেকে এগিয়ে চলেছি, তা তোমরা বুঝতেও পারবে না। **সুগারের বাড়াবাড়ি শুরু হওয়ার পর থেকে, অণিমা প্রয়োগ একদমই বন্ধ করে দিয়েছি। দেহের যে কোষগুলো ব্লাড সুগারে আক্রান্ত হয়ে আছে, রাতের বেলায় অণিমা দিয়ে মিশে যাওয়ার পর, আবার যখন দেহ form হতো, তখন সেই একই অণু থাকতো না। অন্য অণু দিয়ে দেহ গঠিত হয়ে যেত। কোটি কোটি অণু পরমাণু দিয়ে এই দেহ গঠিত। একটার থেকে অন্যটার তফাৎ করা যায় না। ফলে অণিমা দিয়ে মিশে যাওয়ার আগে যে অণুগুলো ছিল, দেহ গঠন হওয়ার পর দেখা গেল যে, তার জায়গায় অন্য অণুরা এসেছে। নতুন কোষগঠন হওয়ার ফলে পুরনো রোগ আর থাকতো না।** যেদিন বুঝতে পারলাম, এর ফলে আমার রেকর্ডে অসুবিধা হতে পারে, সেদিন থেকে অণিমা একদম বন্ধ করে দিয়েছি। এখন অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করি। স্বপ্নে যেভাবে যাওয়া হয়, সেভাবে করি। স্বপ্নে

যখন বেরিয়ে যাওয়া হয়, তখন দেহটা সেই আগেরটাই পড়ে থাকে; নতুন দেহ হয় না।

প্রশ্ন—আজ্ঞে, আপনার রেকর্ড ঠিক আছে কিনা, সেই বিচার কে করবে?

ঠাকুর—আমার বিচার আমাকেই করতে হয়।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যে যত বড়ই হোক না কেন, তার বিচার করার জন্য, তারও উপরে কেউ না কেউ আছে। আমার Status-টা এরকম যে, বিচারের দণ্ডটা আমার উপর ছাড়া আছে। আমার বিচার করার কেউ নেই। তাই আমার বিচার আমাকেই করতে হয়। আমার আরেকটা ক্ষমতা, যেটাও অন্য কারুর নেই, সেটা হলো, **এই বিশ্বের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম অথবা বৃহৎ থেকে বৃহত্তম সর্বত্র সর্বজায়গায়, সর্ব অবস্থায় আমি আধিপত্য করতে পারি।** যা খুশী করতে পারি। তারজন্য আমার কাউকে জবাবদিহি করতে হয় না। এই ক্ষমতা নিয়ে, তোমাদের ঠাকুর এখানে বসে আছে। আর ওদিকে কোর্টে হাজিরা দিতে হচ্ছে, জমি মারার কেসে। কিন্তু কোন সময় এক মুহূর্ত্তের জন্যও, আমার নিজের সুবিধার জন্য আমি কোন ক্ষমতা ব্যবহার করছি না। আমার এত কষ্ট দেখে, জায়গায় জায়গায় বিশাল বিশাল মহানরা চোখের জল ফেলছে, আর বলছে, 'তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। তুমি চলে এস।'

জীবনে দুটো পয়সা রোজগারের জন্য পাকা চুল তোলা থেকে শুরু করে, কাপড় বিক্রি করা, রেডিওর দোকান দেওয়া থেকে শুরু করে, কি না করেছি। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার spiritual ক্ষমতার advantage কখনও নিই নাই। আমার যে কারণে আসা, সেটাই আমার কাছে সব কিছু।

বিশ্বের সব মহানদের অনুরোধে আমার আসা। বীজের মধ্যে গাছের পূর্ণ বিকাশের ক্ষমতা রয়েছে। সব বীজেই সেই ক্ষমতা রয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বীজ হলো জীব। জীবের মধ্যে বীজাকারে এই বিশ্বের পূর্ণ ক্ষমতার সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ণ ক্ষমতার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, সেই চরমতম পূর্ণের জায়গায় কেউ পৌঁছাতে পারছে না। কেউ হয়তো

99% করে ফেলেছে। কেউ আরও বেশী 99.99% করেছে। কেউ হয়তো আরও সূক্ষ্মে পৌঁছে গেছে। কিন্তু কেউই 100-তে reach করতে পারছে না। তখন আমার কাছে অনুরোধ আসে ''তুমি কি একবার birth নেবে? তাহলে আমরা যদি বুঝতে পারি, পূর্ণ হওয়া আর কারুর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না কেন?''

জন্মানোর আগে আমার কাছে দুটো অনুরোধ রাখা হয়েছিল—(১) আমার সব ক্ষমতা আমি ব্যবহার করতে পারবো।

(২) কোথায় জন্মগ্রহণ করবো, সেই ব্যাপারেও আমার বেছে নেওয়ার অধিকার থাকবে। আমি দুটো অনুরোধই অগ্রাহ্য করে নেমে পড়লাম। আমার কোন ক্ষমতাই, আমি আমার সাথে রাখিনি। যেটুকু বিভূতি তোমরা দেখ, সেটা আমার সাথে সাথে হাত পায়ের মতো, যেটুকু থেকে গেছে। ট্রেনটা যখন আসে, তখন পাশ দিয়ে ঝড়ের মতো হাওয়া বইতে থাকে। তারজন্য কি এটা বলতে হবে যে, ট্রেনটা ইচ্ছা করে হাওয়াটাকে নিয়ে এসেছে? তা নয়। ট্রেনটার গতির সাথে সাথে, হাওয়াটা আপনিই এসে পড়ে।

আমার ক্ষমতাগুলোও সেরকম আমার ইচ্ছাকৃত নিয়ে আসা নয়। এমনিভাবেই যেটুকু এসে পড়েছে, তাতেই দেখ, কতো! এই কাজটুকুর জন্যই আমার আসা। অন্য আর যা কিছু দেখ, তার সবটাই এখানকার নিয়ম কানুন অনুযায়ী চলার সুবিধার জন্য আমাকে করতে হয়।

প্রশ্ন—আজ্ঞে, আপনার জায়গায় আর কেউ কোনদিন আসতে পারবে না?

ঠাকুর—এটা আমি কেন বলতে যাব? তবে এত অনন্ত কোটি বছর যে কেউ আসেনি, তা তো তোমরা জানতে পারলে। আমার নিজের মুখ থেকে এই কথা শুনতে, বিশেষ ভাগ্য লাগে। এই জায়গায় একমাত্র আমার সন্তানদের মধ্যেই, কেউ কেউ হয়তো আসতে পারবে। তবে সেটাও আমার খুশীর উপর নির্ভর করবে। এইজন্যই হয়তো তিনজন 'আমি' তৈরী করার অনুরোধ, প্রকৃতি থেকে এসেছে। জানি না হবে কি না, কারণ কখন কোন্ পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে যেতে হয়। যদি কাউকে

তৈরী করতে পারি, তখনই বুঝা যাবে। তবে প্রকৃতি যে চাইছে, সে ইঙ্গিত ৪৫ বছর পূর্ণ করার পর থেকেই আসছিল।

***6C-র বাড়ীতে থাকার সময় ডাঃ হরিহর গাঙ্গুলী আমাকে দেখতে এসে বলেছিল, "আপনাকে কি কেউ কোনদিন বুঝতে পারবে?"** গুরু নিজেও অনেক সময় জানে না, কে তার ঘরানাটা বহন করবে? এনায়েৎ খাঁর বেশী বয়সের সন্তান ছিল বিলায়েৎ। এর ফলে বিলায়েতের দিকে খুব নজর দিতে পারেনি। মাষ্টার পানু, না কে একজনকে শেখানোর জন্য সর্বস্ব দিল, কিন্তু কিছুতেই শিখতে পারলো না। এনায়েতের মৃত্যুর পর যে শোক সভা হলো, সেখানে ছোট্ট বিলায়েতের যন্ত্রে টোকা দেওয়া শুনে, কোন্ ওস্তাদ যেন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল, "আরে, এ যে একেবারে এনায়েতের টোকা!"

গুরুর দৃষ্টি সবসময় সবার প্রতি যে এক থাকে, তাও ঠিক না। ধরো, দুজন শিষ্যকে গুরু একই সাথে একই আদেশ দিল। দুজনের কেউই সেই আদেশ পালন করতে পারলো না। ব্যর্থ হয়ে দুই শিষ্য যখন গুরুর সামনে এসে দাঁড়াল, তখন গুরুর মনে দু'রকম ভাব হলো। প্রথম জনের দিকে তাকিয়ে গুরুর যেন কোথায় একটু কষ্ট হলো, 'এত শেখালাম, এত পরিশ্রম করলাম, তবুও শিখতে পারলো না। ওর জায়গায় অন্য কারুর পিছনে, আমি এই খাটনিটা খাটলে, সে নিশ্চয়ই ভাল করতে পারতো।' অন্যদিকে দ্বিতীয় জনের দিকে তাকিয়ে গুরুর মনে হলো, 'ও' তো ওর সাধ্যমতো পরিশ্রম করেছে। আমারই নিশ্চয়ই শেখানোতে কোথাও গলদ রয়ে গেছে। যদি আরও একটু সময় দিতে পারতাম, তাহলে নিশ্চয়ই সফল হতো। ওর কোন দোষ নেই। আমিই সঠিক সুযোগের ব্যবস্থা করতে পারিনি।' এই দ্বিতীয়জন সাধারণতঃ গুরুর ঘরানা পেয়ে থাকে। এই চিন্তায় যে সবসময় গুরুর নিজের হাত থাকে, তাও না। অনেক কটা factor-এর উপর সবকিছু নির্ভর করবে। তার চলন বলন, পরিবারের আপত্তি আছে কি না? কারণ কাছে রেখে তৈরীর যে সুবিধা পাওয়া যায়, দূরে হলে একটু অসুবিধা হতে পারে। তবে মনে হয়, প্রকৃতি থেকে যখন অনুরোধ এসেছে, প্রকৃতি থেকেই কাউকে হয়তো আমার কাছে পাঠানো হবে। আমি নিজে বেছে নিতে গেলে অসুবিধা

হবে। কারণ আমার মায়াটা এত বেশী যে, বাছাবাছি করা আমার পক্ষে কঠিন হবে। প্রকৃতি থেকে পাঠানো হলে, আমার বাছবিচার করার কোন দায়িত্ব থাকলো না। কারুর কিছু বলারও রইল না।

প্রশ্ন—আজ্ঞে, তিনজনকেই কি প্রকৃতি পাঠাবে?

ঠাকুর—তা আমি কিভাবে বলবো? তিনটাও হতে পারে, একটাও হতে পারে। আবার কোনটাই নাও হতে পারে। তবে হলে, প্রকৃতির কাজের পক্ষে যে খুব সুবিধা হবে, এটুকু বলতে পারি।

আমি যে তোমাদের সন্তান করেছি, এটা তোমাদের উদ্ধারের জন্য। তোমাদের এখনকার মাত্রা, আর আমার মাত্রার তফাৎটা, তোমরা এই মুহূর্ত্তে চিন্তাতেও আনতে পারছো না। যারা চলে গেছে, তারা কিছুটা এখন বুঝছে। **অশ্বিনী চ্যাটার্জী মুন্সীগঞ্জে মৃত্যুর সময় বলছে, "ঠাকুর, তুমি কোথায়, আর আমরা কোথায়? অবাক হচ্ছি, তোমার সাথে আমাদের দেখা হলো কি করে?" অশ্বিনী যাওয়ার সময়, ঢাকার স্বামীবাগ বাড়িতে আমার সাথে দেখা করে গেছে। রবি ঘোষ ও মহম্মদ আলী তখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ওরাও অশ্বিনীকে দেখেছে। কিন্তু ভেবেছে, অশ্বিনী বুঝি এমনিই আমার সাথে দেখা করতে এসেছে। পরে সন্ধ্যাবেলায় মুন্সীগঞ্জ থেকে যখন খবর আসলো, তখন বুঝলো।**

খুব সাধারণের মতো তোমাদের সাথে মিশি বলে, তোমরা এখন আমাকে বুঝে উঠতে পারছো না। ফলে এই বীজ পূর্ণরূপে ফুটে উঠতে বহুদিন লেগে যাবে। মৃত্যুর পরে আরেকটা অবস্থায় তোমাদের নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে আবার আরও উঁচুতে ফুটে ওঠার পথ বলে দেওয়া হবে। এইভাবে চলতে চলতে, কবে যে সেই পূর্ণ অবস্থায় যাবে, এই মুহূর্ত্তে তা বলা কঠিন।

এখানেই এমন অনেক বীজ আছে, যেমন তালগাছ—যা একজন পুঁতলে, তিন চার পুরুষ পরে ফল পায়। ফলে বীজ থেকে ফুটে উঠতে, অনেক সময়ের ব্যাপার। তারপর ফুটে ওঠার পর, ঠিকমতো জল দেওয়া, সার দেওয়া—এসব তো লেগেই আছে। আবার হয়তো দেখা

গেল, যদিও বা একটু ফুটে বের হলো, তাও আবার ছাগল বা গরু এসে খেয়ে গেল। তারজন্য বেড়া দিয়ে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা দরকার। সব কিছু করেও দেখা গেল, এমন একটা ঝড় হলো, গাছটা ভেঙ্গে গেল। এইসব করে ফল দিতে দিতে অনেক দেরী হয়ে যায়।

কিন্তু কলমের গাছ খুব অল্প দিনের মধ্যে পরিণতি পায়। কারণ direct ঐ গাছের অংশ ওর মধ্যে থাকে। একটা হলো, সন্তান করা হচ্ছে, উদ্ধারের ব্যবস্থা করার জন্য, সাথে সাথে যতোটা তৈরী করা যায়। আরেকটা হলো, শুধুমাত্র তৈরীর চিন্তা নিয়ে কাজ করা। কলমের গাছ যেভাবে তৈরী করে, সেভাবে যদি কাউকে তৈরী করতে পারি, তবে সে খুব দ্রুতগতিতে আমার বুঝগুলি, বুঝে নিতে পারবে। বীজ থেকে গাছ তৈরী করতে যেখানে বহুদিন লেগে যায়, কলমের গাছের ক্ষেত্রে কিন্তু তার চেয়ে অনেক কম সময়ের মধ্যে, সে ফুটে উঠতে পারবে। যেমন সিঁড়ি দিয়ে ওঠা, আর লিফ্‌টে ওঠা।

সিঁড়ি দিয়ে যে উঠছে, তাকে কতো কষ্ট করে উঠতে হচ্ছে। হার্টের পেশেন্ট হলে তো মাঝপথে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু লিফ্‌টে যে উঠছে, সে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ৫০ তলায় চলে যাবে। সিঁড়ি দিয়ে যে উঠছে, সে প্রত্যেকটা তলার খবর নিতে নিতে উঠবে। আর লিফ্‌টে ওঠা ব্যক্তির কাছে নীচের তলা আর ৫০-তম তলার খবর থাকবে। অন্য কোন তলার খবর থাকবে না।

কলমের গাছ যারা, তারা ঐ লিফ্‌ট দিয়ে ওঠা ব্যক্তির মতো। যেহেতু তাদের Speed অন্যদের থেকে অনেকটা বেশী, তাই তারা আমাকে তখন অনেকটা বুঝতে পারবে। যে যে Stage দিয়ে Pass করতে অনেকসময় লেগে যায়, সেইসব Stage ওরা অনায়াসে খুব অল্প সময়ে Pass করে চলে যাবে।

এই বিশ্বে আমার গতি খুব বেশী হওয়ার জন্য, আমার সাথে তাল রাখার ব্যক্তির বড় অভাব। তাই হয়তো বিশ্বপ্রকৃতি থেকে, এই কলমের গাছের অনুরোধ এসেছে। তবে আমিও এটা, প্রকৃতির উপরই ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। প্রকৃতি থেকে কাউকে নিশ্চয়ই পাঠাবে। তবে সবকিছুই

নির্ভর করবে, আমার খুশীর উপর। এটা জোর করে, করার জিনিস নয়। একমাত্র খুশী থাকলেই আমি করতে পারবো। তখন আমার তত্ত্বটা তার মধ্য দিয়ে reflected হবে। তবে বীজ থেকে কি হবে না? নিশ্চয়ই হবে। আমার কোন বীজই অযথা নষ্ট হবে না। সব বীজই ফুটে উঠবে। সেই চিন্তা নিয়েই তো আমি দীক্ষাটা দিয়েছি। কিন্তু বীজ থেকে পূর্ণ গাছ ফুটে উঠতে, সময় অনেকটা লাগছে বলেই, প্রকৃতির এই কলমের চিন্তা। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

*6C পার্বতী চক্রবর্ত্তী লেনের বাড়ীতে শ্রীশ্রীঠাকুর ১৯৫৩ সালে, কয়েক মাস অবস্থান করেছিলেন। সেই সময় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিদিন গড়ে তিন চারটি করে ক্লাস করতেন। সেই কারণে তাঁর গলা chocked হয়ে গিয়েছিল। ডাঃ হরিহর গাঙ্গুলীর নির্দেশে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলা বন্ধ ছিল। তবে প্রতিদিনের ক্লাস বন্ধ থাকলেও সেই সময় তিনি 'নির্দেশ' বইটি লিখেছিলেন।

বিঃদ্রঃ-পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের শুভ উপনয়ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, বাং ১৩৪০ সালের ১২ই আষাঢ়, সোমবার, ইং ২৬শে জুন, ১৯৩৩ সালে। সকাল ৬-১৩ মিঃ থেকে ১০-৩০ মিঃ পর্যন্ত শুভ তিথির মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের মাতুলালয় দোগাছিতে শাস্ত্র মতে এই শুভ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের মাতুল (মেজ) পণ্ডিত হেরম্বনাথ তর্কতীর্থ, তাঁর আচার্যগুরু হয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এই সমস্ত উৎসব নিয়ে কখনও মাথা ঘামাতেন না। কিন্তু ভক্ত-শিষ্যদের একান্ত আগ্রহে অনেক কিছুতেই তাঁকে সম্মতি দিতে হয়। ঘটনাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত-শিষ্যরা শুভ উপনয়ন (পৈতা) দিবস উপলক্ষ্যে বাং ১০ই আষাড় দিবসটি, অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে পালন করে আসছে।

একত্ব অবস্থা চলবে চিরন্তন।
সাথে সাথে যাহা যাবে, সবকিছু চিরন্তন।

পুরী

১লা মার্চ, ১৯৫২

এই Individuality maintain (একত্ব অবস্থায় অবস্থান করা) করিয়ে দেওয়ার capacity (ক্ষমতা) এই বিশ্ববিরাটের সমস্ত অণুতে অণুতে বিদ্যমান রয়েছে। তাই ব্রহ্ম (বিরাট) নামে অভিহিত হইয়া বিরাটের সুরে, অনাদি অনন্তরূপে গণ্য হইয়া আছে। পদার্থগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবস্থায় বিরাজ করছে সত্য, কিন্তু বিভিন্ন কার্যে বিভিন্ন অবস্থায় শক্তির তারতম্যতা থাকা স্বাভাবিক। নানা মাত্রাভেদে এই শক্তির বিকাশ যদিও অণুপরমাণুতে অবস্থিত, মহাশূন্যতে যে বিরাট নামটি কথিত, তার তুলনার্থে তারই অণুর পর্যায় বলে বর্ণনীয়, তথাপি যেমনি করে অণুগুলি maintained (অবস্থিত) হয়ে আছে মহাশূন্যের নিকট, তেমনি করে Individuality (একত্ব)-র অবস্থা তাদেরই মধ্যে maintained অবস্থায় অবস্থিত হয়ে আছে বা রয়েছে। আবার এই একত্ববোধ হতে, এই একই শক্তি হতে চালিত হচ্ছে পার্থক্য বোধ। সর্ব অবস্থায় একত্ববোধে যে শক্তি চালিত, সমস্ত সূক্ষ্ম পদার্থগুলিতে তেমনি ঐ পার্থক্যবোধও চালিত হচ্ছে। সেই শক্তিতেই অনাদি অনন্তকাল হতে সৃষ্টির ধারাবাহিকতা চলেছে। সুতরাং এই কথাটি ভুললে চলবে না যে, অণুগুলি সর্বগুণে বিভূষিত। তাই একত্ব অবস্থাতে অবস্থিত করে দেওয়ার যে গুণ, সেই গুণও অণুতে বিদ্যমান।

বহুতে বহুরকমভাবে বহু অবস্থায়, বিভিন্ন রকমে রকমে, বিভিন্ন আকারে রূপের স্বরূপতা প্রকাশ করা ও করে দেওয়া যে অণুরই ক্ষমতা। তাই সেইগুণে গুণান্বিত অবস্থায় অবস্থিত হয়ে সেই অণুগুলি বিদ্যমান। বহু আকারে বহুরূপে, বহু আকারের সমন্বিত রূপবিশিষ্ট যে রূপ, সেইরূপ, গুণ সমন্বিত অবস্থায় এই রূপেতে (শক্তিতে) maintained (অবস্থিত) হয়ে আছে। অণুগুলির সেই স্বরূপকেও, স্বরূপত্বকেও, তত্ত্বের তত্ত্বকেও রূপ মনে করে, রূপে রূপে তার Individuality (একত্ব) বজায় রেখে রেখে, সর্বগুণে

গুণান্বিত করিয়ে দিয়ে সেই আকারটাকে Maintain করে চলেছে। সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারায় নামে নামে যা পার্থক্য বলে অভিহিত, সেই নামকরণ শব্দটির অর্থবোধের যে অর্থ, তাহাও Maintain করিয়ে চলেছে। একই শক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। আবার সকল গুণকে একান্নভুক্ত করে দেওয়ার অবস্থাগুলিও একান্নভুক্ততে গ্রথিত। সুতরাং শব্দটি একবাদী রয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একবাদী (শক্তি) আবার বহুর বহুত্বতে বহু অবস্থাতে বহুভাবে প্রকাশ। তাতেও এক ছাড়া নয়। তাই আমাদের নিজ নিজ দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি, সমস্ত চেতনাদি এই সমন্বয়ে মিশ্রিত। যেমন আমি যাহা পাইতেছি, আমি যাহা শুনিতেছি, আমি যাহা দেখিতেছি, 'আছি' বলেই তো পাচ্ছি। 'আছি' আবার আগের পাওয়াকেই তো পাচ্ছি। **এই বহু অণু মিশ্রিত আকারে আবার বিশিষ্টরূপে পরিচিত যে 'আমরা' ও 'আমি', তাহা আবার নানা ভাষায় কথিত হওয়াতে "ভাষা শব্দ ব্যবহৃত"। সবই যে অণুরই সম্মিলিত বাণী।** সেই ধারাবাহিক যাহা, তাহা প্রয়োজনের প্রয়োজনেতে ব্যবহৃত হচ্ছে; যেমন 'আমি', 'তুমি' ইত্যাদি শব্দগুলি এই সমন্বয়ে রয়েছে।

আবার অন্য শব্দ যেমন ধ্যান-ধারণা, যোগ, তপ, জ্ঞান, অজ্ঞান, পাপ-পূণ্য—এই যে ভাষার নানা অলঙ্কার, এইসব ভাষা আবার নানা অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে আছে। আকারের বৈশিষ্ট্যে যে Individuality, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি শব্দগুলিতে সেটা maintain করে করে, নানাভাবে চালিত হয়ে, আমরা চালিত হয়ে, আছি। তাই আমাদের গোচরে, আমাদের অনুভূতিতে ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্যেতে যাহা, তাহা সঞ্চিত চেতনার দ্বারাই যে সঞ্চয় করে নিচ্ছি। এই সমস্ত ভাবগুলিকে সচেতনতার দ্বারা সচেতন করে করে, ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যেতে যে এসেছি, তাহাতে 'বর্ধিত' ও 'উন্নতি' নামে যে প্রচলিত ভাষা, তাহাতে অণুর সম্বন্ধে সমন্বিত যে মন, সেই মন সমন্বয়ের শক্তির দ্বারাই শক্তির প্রকাশ ও বিকাশ করে।

কথিত ভাষার ভাব নিয়ে নিয়ে, উন্নতির কল্পনার্থে যে বুঝে বুঝিত হয়ে আছে মন, সেই বুঝে আমরা যতটুকুনু বুঝি, সেই বুঝেতে যতটা এই আবহাওয়াতে আসে, সেই কথিত ভাষায় যে ভাবগুলি তৈয়ারী করা আছে, বা দেওয়া হয়েছে, তাহাতে এই আকার বিশিষ্টের চেতনা, রূপের চেতনার বিকাশ বিকশিত হয়ে রয়েছে। কথিত ভাষায় ভাবগুলির অর্থকে, অর্থবোধে

মনে হয়, সমন্বয়ে বুঝিত বুঝগুলিতে অবুঝেরই আর একটি ইঙ্গিত পরিব্যাপ্তমান। এই অবস্থায় অবস্থিত হওয়ার জন্যই হোক আর যে জন্যই হোক, কথিত ভাষার ভাবগুলির অর্থ সম্পূর্ণরূপে সমস্ত বুঝেতে বুঝে বুঝে, অবুঝের অবস্থাতে বিরাজিত হয়ে রয়েছে, বলে মনে হচ্ছে। তাই সমন্বয়ের বুঝের যে বুঝ বুঝিত হয়ে আছে, সেই বুঝকেই নিয়ে চলেছি। এই সমন্বয়ের আকার বিশিষ্ট রূপটিতে সেইভাবে সেই আকার বিশিষ্টটি কার্য করে যাচ্ছে। অবুঝকে বুঝে বুঝে ভাবগুলিও ভাব অর্থ না জেনে, উপায়ান্তর না দেখে, সেই কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করে যাচ্ছে। তাতে এই মহাশূন্যতে অবস্থিত যে অণুগুলি বিদ্যমান, তারা যদি সমস্ত গুণে গুণবিশিষ্ট হয়ে থাকে, তবে ভাষার ভাব অর্থ ও অবুঝগুলিকে maintain করে চলেছে। তাই **আকার বিশিষ্টটি যে ধ্যানধারণা, জপতপ ইত্যাদির মূলে, সে ভুল হোক, আর শুদ্ধই হোক, আকারটি হতেই যে উদ্ভব। প্রাণ, মন তাহাকে যে সত্য বলে গণ্য করে নিয়েছে। তাই অণুগুলিও সেই সাড়া দিয়ে যাবে।** সুতরাং সংস্কারেই হোক আর সংস্কারবর্জিত অবস্থাতেই হোক, খেলাতেই হোক, মিথ্যাতেই হোক, প্রবঞ্চনাতে হোক, যেভাবেই হোক না কেন, সবই যে অণুর সমন্বয়েই সমন্বিত অবস্থাতেই, এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ধ্যানধারণার আকারবিশিষ্ট রূপটিতে নিবিষ্ট হয়ে রয়েছে যে মন, সেই মনই এই সমস্ত ভাষা ও ভাবকে টেনে আনে। সেই চিন্তায় চিন্তিত অণুরাই অণুকে গড়িয়ে গড়িয়ে একটির পর একটি অবস্থার অবস্থায় আনে। কারণ হল, এই যে Individuality যখন Maintain করে চলেছে, তখন ভাব অর্থও যে Maintain করে চলবে, তাহা স্বাভাবিক। এই আকার বিশিষ্ট রূপটি নিয়ে, যখন সাধনাতে ধ্যানেতে মনোনিবেশ করে প্রতিটি ভাষা হতে ভাবকে নিয়ে উন্নতির প্রচেষ্টাতে, তাহা এই বাস্তবরূপের এই আকারবিশিষ্ট রূপ হওয়া স্বাভাবিক। তার কারণ সমন্বয়ের বুঝগুলিতে কতকগুলি অবুঝের বুঝ বুঝিত হয়ে রয়েছে, যদিও সবই আবার বুঝ।

এই Individuality চলবে চিরন্তন, সাথে সাথে যাহা যাবে, সবকিছু চিরন্তন। কি যাবে, কি নেবে, কি থাকবে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। সাগরের জলের স্রোতে যেমন সবকিছু খড়কুটা ভেসে যায়, তাতে তার (সাগরের) কি এসে যায়। তেমনি করে Individuality রূপে যে সাগর, তাতে ডাঙ্গার যে ভাষা, ভাষার যে ভাব, তার যে অর্থ, সেগুলি

হয় সংস্কার, হয় মিথ্যা, হয় বিজ্ঞান; কোন্‌টা ঝুটা, কোন্‌টা ফেনা, কোন্‌টা কি সবকিছুই ভেসে যাচ্ছে এই মহাশূন্যের শূন্যেতে। একটি আকার বিশিষ্ট হয়ে এক একটি রূপে তার Individuality বজায় রেখে, সে আপন সত্তায় বিরাজিত অবস্থায় রয়েছে। তাতেই চলেছে চলার পথে যুগযুগান্তর ধরে। তবে কিছুই তো বাদ দিয়ে গেল না। সব কিছুই যে নিয়ে গেল সাথে করে। এখন Individuality-র সত্তাগুলির যে কি সত্তা, সে যে কি অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে গেল, ঠিক যেন বাপের বাড়ী হতে শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার মতো সেই সজ্জিত অবস্থা, সেই উপমা মূলক বাণীতে সংবদ্ধ। এই অলঙ্কারে যে ভূষিত, সেগুলি হীরা, পোখরাজ না কাঁচ, সোনা না লোহা, কি যে অলঙ্কারে, কোন অলঙ্কারে যে সজ্জিত হয়ে গেল এই Individuality; তারপর এক একটি আকার বিশিষ্ট হয়ে, এক একটি রূপে রূপ যে নিয়ে নিল, তাতেই সর্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হল। তবে একটি জিনিস থেকে যাচ্ছে যে, সমস্ত শাস্ত্রকারেরা গ্রন্থকাররা যা দিয়ে গেছেন, যে মূল উদ্দেশ্যের উদ্দেশ্যে সাধনা করে গেছেন ও করছেন, তাদের পথ অনুযায়ী তারা ভুল মত ও পথ অনুসরণ করেন নাই। এখন দেখতেহবে অলঙ্কারের ধাতুগুলি কোন্ ধাতুর তৈয়ারী, Jewells (রত্ন) গুলিতে কোন্ stone (পাথর) রয়েছে।

এই পরিদৃশ্যমান জগতের অণু পরমাণুগুলির বিশিষ্ট সমন্বয়ে সব কিছু হচ্ছে। এখানকার কার্যপদ্ধতি যদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখা যায় এবং যতটুকুনু তার ভাবগত অর্থ, সেই ভাবকে নেওয়া যায়, তাতে এই সাধনাতে যদি মনোনিবেশ করে কাজ করা যায়, তবে আমরা কি উপলব্ধি করতে পারি? যে জিনিস সাধনাতে অথবা ধ্যানেতে উপলব্ধি হয়, যে জিনিস যোগীরা অথবা মহানরা চেয়ে চেয়ে সাধনাতে এগিয়ে গেলেন, তাহা সিদ্ধি, মুক্তি, নির্বাণ যা কিছু হোক না কেন, তার কতটুকুনু বিষয়ে তারা অবগত হয়েছেন, সেই বিষয় চিন্তার বিষয়। বিষয়গুলির বিশদ তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথমতঃ জানা উচিত ও জেনে নেওয়া উচিত। তাদের মত অনুযায়ী তারা যদি গিয়েই থাকেন অর্থাৎ পৌঁছেই থাকেন, অবস্থাগুলি সম্বন্ধে জানানো প্রয়োজন। তাদের জ্ঞানগরিমা হতে, তাদের ব্যক্তিত্ব হতেই যে পথ নির্দেশমূলক বাণী বের হবে, তাদের নিজস্ব উপলব্ধিতে যে বাণী বের হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যতটুকুনু দেখা যাচ্ছে, ততটুকুনু শুধু আইনগত উপলব্ধি হওয়া যে বস্তু, তারই সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

তারই তারে যেন সূক্ষ্ম সূক্ষ্মাকারে সূক্ষ্ম ভাষাতে কাব্যের ছড়াছড়ি। সেই রূপেও আজকে মহাকাব্যের রচনা হয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে। এই যে দেওয়া, রূপের আকারে রূপ নেওয়া, এটি উদ্ভাসিত হওয়ারই এক অবস্থার বাণী হয়ে যাচ্ছে। অবুঝতার মাঝে মাঝে থেকে থেকে যে বুঝগুলো, সেই বুঝগুলো অবুঝের দিকে কার্য করে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। ভাষা আর ভাবেতে এক অবস্থার ক্রিয়ার মত লাগছে না, যদিও ভাব আর তার ভাবার্থকে বিশ্ববোধে নিয়ে নেওয়া যায়। নিজের কায়াবিশিষ্ট যে তাকে, নিজের সত্তাকে বিশ্ব বিরাটের বোধে নিয়ে নেওয়া, বুঝিয়ে দেওয়া, জাগিয়ে দেওয়া, এটাই সাধনা। তেমনি করে সেইভাবে ধাঁচে ধাঁচে এগিয়ে গিয়ে, তন্ময় হয়ে তন্ময়িত অবস্থায় যে বিরাজ করবে, সে অবস্থা দেখা যাচ্ছে না। তার বাইরের ভাবাবেগে আপ্লুত হওয়া আচরণ, সংস্কার ও আণুষঙ্গিক ভাব যা কিছু দেখা যাচ্ছে; তাতে সাধকরূপে পরিচিত হওয়া যাচ্ছে না। সেই **অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুগুলোর সাথে একবোলে বোল দিতে হবে। তবেই তুমি বলীয়ান হতে পারবে।** সেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থগুলির মিলিত অবস্থা কায়াটির রূপ দিয়েছে। সেই যে রূপ একটা মেঘকে আবরণের মত অথবা কুয়াশার মত হয়ে, এই তেজবান সূর্যকে সাময়িকভাবে আবৃত করে রেখেছে। এই সূর্যটি বাষ্পীয় এক অবস্থার এক বিশেষ রূপ হয়ে, এই যে কুয়াশা ও মেঘ হয়ে, তাকে (তারই এক অংশকে) আবার সাময়িক আবরণ দিয়ে রেখেছে। তাতে আর বিচিত্র কি? যেমনি করে সমন্বয়ের যে রূপটিতে ও তার সমস্ত সমন্বয়ে সমন্বিত বুঝটিতে, তার কায়াটিতে এক সাময়িক আবরণ রয়েছে। সেই বুঝেতে আর কায়াতে কিভাবে আছে? যেমন করে আছে সূর্যতে আর পৃথিবীতে। সেই আবরণের বস্তুগুলি তেজস্ক্রিয় পদার্থের আর একটি রূপ বিশেষ। তেজেই আবার মেঘ ও Fog (কুয়াশা) চলে যায়। অণুতে আর কায়া অণুতে অথবা বুঝ অণুতে যে আবরণটি রয়েছে, সেই আবরণটি তেজের দ্বারাই আবার দূরীভূত হবে। যেমনি করে যে শক্তিতে সম্মুখে আসে, সেই শক্তিতে আবার দূরে চলে যায়। সেই সঞ্চিত শক্তিকে বর্দ্ধিষ্ণুর ধারাতে বর্দ্ধিষ্ণু করে চলেছে কায়ার রূপটি, অজ্ঞানতার সেই আবরণটিকে দূরীভূত করে দেবার জন্য। প্রকারান্তরে সেই অবস্থাকে যেমন বুঝতে পারে না, মানতে পারে না, তাই **অন্তর্যামিত্বহীন এই সমস্ত অবস্থার জন্য অজ্ঞানতার নামকরণ করেছে। জ্ঞানে হয় তার নিবারণ।** সেই জ্ঞানের

সাধনায় তারা এগিয়ে চলেছে। সঞ্চিত জ্ঞানগুলি বিদ্যমান আছে। আবার সমন্বয় যুক্ত যে বুদ্ধির বিকাশ হল, তাতে সে নিজেও আবার কতগুলি আবরণরূপ অজ্ঞতার সৃষ্টি করে, আবরণের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। যে রকম তেজবান্ সূর্যের দিকে যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকা যায়, তাহলে কতক্ষণ পর সেই চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হয়। তারপর সেই অবস্থায় যখন পৃথিবীর রূপকে দেখতে আসা যায়, তখন সমস্ত বিশ্বের রূপটি অন্ধকারময় হয়ে যায়, যদিও বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। এই অন্ধকারযুক্ত অবস্থাটি নিজেই নিজের creation-এ (সৃষ্টিতে) উদ্ভব করেছে, যেহেতু আইনগত সমন্বয়শক্তির creation রয়েছে বিদ্যমান। সেই শক্তিতে এই অন্ধকার যুক্ত অবস্থার একটি অবস্থা করা হয়েছে। ঠিক তেমনি করে এক একটি কায়াবিশিষ্ট রূপ বহু সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে, বহু অজ্ঞানতা জনিত নানাপ্রকার কার্যকলাপ করে চলেছে, যেমন Depression of mind (মনের হতাশা জনিত অবস্থা) ইত্যাদি। এর ফলে কিছুই ভাল লাগে না। আরও আছে, নানা সমস্যাপূর্ণ বাণী, সমস্যার চিন্তা এবং যাবতীয় Disturbance (অশান্তি), যেমন Disturbance of mind and everything. এই সমস্তগুলি কতগুলি তেজস্ক্রিয় জাতীয় বস্তু হয়ে, এই কায়াবিশিষ্ট রূপটিকে আকর্ষণে আকর্ষণে সর্বদাই আকর্ষণ করে চলেছে। এই কায়াবিশিষ্ট রূপটি এইসমস্ত Circumstance গুলির দ্বারা influenced হয়ে, ঠিক সূর্যের তেজের মতন, এই কায়াবিশিষ্ট রূপের সম্বন্ধে বুঝটুকুর ভিতর influenced হয়েও, আকারে নিয়ে নেওয়ার জন্য টেনে নেয়। এখন এই আকারটি হল অন্ধকারযুক্ত অবস্থার মত। সেই অন্ধকার যুক্ত অবস্থাই পৃথিবীকে অন্ধকার দেখাইয়া দিল, যদিও পৃথিবী অন্ধকার ছিল না। এই কায়াবিশিষ্টরূপটির বুঝ অণুগুলি অন্ধকার যুক্ত অবস্থা হয়ে, অন্য অণুগুলোকেও ঠিক তেমনি অন্ধকারে রেখে দিল। ঠিক তেমনি সমস্ত জিনিসগুলির বস্তুগুলির যে অণু, সেই অণুগুলির যে আলো, অন্যান্য অণুগুলির যে আলো, ঠিক পৃথিবীর আলোর মতন। কিন্তু যে আলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেনি, সেই বুঝরূপ যে অণু, সেই অণু নিকটে। সেই বুঝ অণু গুলিও অপর অণু ঠিক এক অন্ধকার যুক্ত অবস্থায় সাময়িক অবস্থিত হওয়ার মত হয়ে রইল।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা, S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, রেখা মিত্র, ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) বীরেন্দ্র দর্শন, জয়ন্ত দে, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোল-৫, ফোন- ২৫৩০-৪৮০৭
৪) সৌরীন্দ্র নাথ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬, ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) বিনয় মোদক, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) গৌর মুখার্জী, ১১/৫, পর্ণশ্রী, বেহালা, ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) বেদধাম, ইছাপুর, উঃ ২৪-পরগণা, মোঃ- ০৯৪৩৩৯৫৯১৩৮
৮) কোলকাতা বইমেলা।
৯) জলধর সাহা, সেক্রেটারী সন্তান দল, মেঘালয়, মোঃ- ৯৪৩৬১১২৬০১
১০) বলরাম, ৩৪ এস.কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮, মোঃ- ৯৮৩৬৬৯৯৪৪৮
১১) Lakshindhar Das, Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১২) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন, লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৩) সুভাষ ঘোষ, বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন - ০৩৬৬৭-২৫১১৭৯
১৪) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন - ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৫) উত্তম চ্যাটার্জী — নিয়ামতপুর, আসানসোল, ফোন - ০৩৪১-২৫১৫০৬৬
১৬) মধুসূদন মৈত্র পুরুলিয়া, ফোন - ০৯৮৩১৬১১৬৮৪
১৭) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা, ফোন - ৯০০৭০৭৫১৯৯
১৮) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯
১৯) তরুন/ইরা জোয়ারদার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২৪৫১৯
২০) রমা নাথ মহন্ত, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ০৯৭৩৩৩৩৯৪৩২
২১) বিভাস চক্রবর্ত্তী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মোঃ- ০৯৬৪৭৭৯২৫২২
২২) ভোলানাথ দাস, কালনা গেট, বর্ধমান, ফোন - ৯৪৭৪৬৯৫৬৫৪
২৩) তপন / অনিমা গাঙ্গুলী, মানকুন্ডু, হুগলী, ফোন - ২৬৮৫-৬১৪৬
২৪) কালিপদ চক্রবর্ত্তী, পাখানজোড়, ছত্রিশগড়, মোঃ- ৯৪০৬০০১৫৭২
২৫) গনেশ রায়, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি, মোঃ- ৯৭৪৯০৯০১৮২
২৬) বেদ অভেদ ধাম, হরে কৃষ্ণ, আলিপুরদুয়ার জং, মোঃ- ৯৪৩৪২০৪৫৯০
২৭) ইতি বর্মন, দিনহাটা, কোচবিহার, মোঃ- ৯৯৩২৬৩৯৬৩৯
২৮) ভগীরথ সাহা (ভগু), গোয়ালাপট্টি, কোচবিহার, মোঃ- ০৯২৩৩২৩৭৬৬৬
২৯) আর.এন.আর এন্টারপ্রাইজ, ফোন - ২৪৪০-৯১৫১
৩০) ডঃ সুধাংশু দত্ত, মালিগাঁও, গুয়াহাটি, আসাম, ফোন - ০৯৪৩৫১৯০৭৮১

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

	পুস্তক পরিচিতি	*প্রকাশকাল*
১)	বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২)	মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩)	পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪)	সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫)	অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬)	১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭)	বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮)	শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯)	তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০)	দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১)	পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২)	অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩)	বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪)	সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫)	পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬)	জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭)	মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮)	আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯)	কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০)	জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১)	তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২২)	মহামন্ত্র মহানাম	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫
২৩)	পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫
২৪)	চেতনা ও মহাচৈতন্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬
২৫)	মনই সৃষ্টির উৎস	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৬
২৬)	সাধু হও সাবধান	শুভ মহালয়া, ১৪১৬
২৭)	লং পাহাড়ের ডায়েরী	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৬
২৮)	বাস্তব ও অধ্যাত্মবাদ	শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৯
২৯)	যত্র জীব তত্র শিব	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৬
৩০)	ম্যাসেঞ্জার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৭
৩১)	আলোর পথিক	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৭

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
২)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
৩)	পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3)	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫